দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

হিন্দু অত্যাচারিত ও খুন হলে
কোনো কবির কলম
গর্জে ওঠে না
— পৃঃ ৩০

৭৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ১২ অক্টোবর, ২০২০।। ২৫ আশ্বিন - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

ধর্ষণ নিয়ে রাজনীতি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ২৫ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১২ অক্টোবর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৩

বাবরি মসজিদ মামলায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা আবারও প্রমাণিত হলো ▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ৪

ধর্ষণ নিয়ে রাজনীতি নেতিবাচক পরিণতিকেই ডেকে আনে ▯ সুজিত রায় ▯ ৬

টর্চের আলোয় পশ্চিমবঙ্গের হাল-হকিকত দর্শন ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৯

দিদির বড়ো ভুলো মন, ভুলে যান কামদুনি থেকে উলুবেড়িয়ার ধর্ষিতার কথা ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১২

হাথরসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি যখন কলুষিত হয় ▯ দেবযানী হালদার ▯ ১৩

হাথরস কাণ্ড : হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৭

হাথরস কাণ্ডে আদত অপরাধী কে বা কারা? ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ▯ ১৯

শ্রম আইনগুলি সংস্থার কাজের পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নিরাপদ করবে ▯ সঞ্জীব বাজাজ ▯ ২৩

শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাজারোপযোগী করাটা সময়ের দাবি; এর বিরোধিতা দুর্ভাগ্যজনক ▯ ড. তরুণ মজুমদার ▯ ২৫

শিক্ষা ব্যবস্থা মাতৃভাষা, ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সফল প্রয়োগ ▯ ড. বিপ্লব পাল ▯ ২৮

বর্তমানে হিন্দু অত্যাচারিত ও খুন হলে কোনো কবির কলম গর্জে ওঠে না ▯ বটুকৃষ্ণ হালদার ▯ ৩০

ভবিষ্যতের ভীতিপ্রদ জৈব মারণাস্ত্র ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ৩২

মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত একদল মহাপ্রাণ ▯ অজয় সরকার ▯ ৩৫

রাজনীতির জাতাকলে পিষ্ট প্রকৃত দলিতরা ▯ সুজন পাণ্ডা ▯ ৩৮

উন্নয়নের পাশ্চাত্য ধারণা বনাম হিন্দু দৃষ্টিকোণ : রাষ্ট্রঋষির বিচারবোধের নিরিখে ▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ৪০

করোনাকালেও হিন্দুদের ওপর হামলা চলছে বাংলাদেশে ▯ ৪৪

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা ▯ ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ৪৫

উত্তরবঙ্গে ক্রমবর্ধমান লাভজিহাদের ঘটনা ▯ তরুণ কুমার পণ্ডিত ▯ ৪৭

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সব কিছুতেই রাজনীতি করা বন্ধ হউক

নারী নিগ্রহ, নারী লাঞ্ছনা, বলাৎকার ইত্যাদি কোনো সভ্য সমাজই সমর্থন করে না। দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত। ইহাই সুস্থ সমাজজীবনের লক্ষণ। ভারতবর্ষীয় সমাজে নারীকে মাতৃজাতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের সমস্ত দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি হিসাবে বন্দনা করিবার কথা বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি নারী লাঞ্ছনা নিরন্তর ঘটিয়া চলিয়াছে। এবং তাহা লইয়া বিস্তর রাজনীতিও চলিতেছে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের হাথরসে ১৯ বৎসরের এক যুবতীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া পরিবেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত কংগ্রেস, তৃণমূল ও বামদলের অভিযোগ হইল তাহাকে ধর্ষণ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাহারা কেন্দ্রের মোদী সরকার ও উত্তর প্রদেশের যোগী সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো ঝড় তুলিয়াছে।

হাথরসের ঘটনার তদন্ত চলিতেছে, তবুও যাহাকিছু প্রকাশ্যে আসিয়াছে তাহা হইল ওই যুবতীর সহিত ধর্ষণের মতো কোনো ঘটনা ঘটে নাই। অভিযুক্ত সন্দীপ সিংহ পুলিশের নিকট তাহার জবানবন্দিতে জানাইয়াছে যে, মেয়েটির সহিত তাহার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মেয়েটির মায়ের তাহাতে আপত্তি ছিল। মা ও দুই ভাই মিলিয়া মেয়েটিকে প্রচণ্ড মারধর করে। তাহাতেই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে নাকি যুবতীর মাকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে ধর্ষণের কথা বলিয়া যোগী সরকারের বদনাম করিবার জন্য। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে জিহাদি ও আরবান নকশালারাও চক্রান্ত করিয়াছিল তপশিলি ও তপশিলি উপজাতি সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষে জাতিদাঙ্গা ছড়াইয়া দিতে। ইহার জন্য ১০০ কোটি টাকার ফান্ডিংয়ের কথাও প্রকাশ্যে আসিয়াছে। হাথরসের ঘটনার পরে পরেই উত্তর প্রদেশেরই বলরামপুরে ২২ বৎসরের এক যুবতীকে ধর্ষণ করিয়া হত্যা করিয়াছে দুষ্কৃতীরা। কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে একাধিক স্থানে একই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে কিন্তু রাহুল গান্ধীরা টুঁ শব্দটি করিতেছেন না। হায়দরাবাদের প্রিয়াঙ্কা হত্যার ঘটনায় ইহারা কেউ পথে নামেননি। তেলেঙ্গানা সরকারকেও দায়ী করেননি। এরা কখন কখন পথে নামিবেন আর কখন নামিবেন না তাহা নির্ভর করে বিজেপি সরকার কোথায় কোথায় শাসন ক্ষমতায় রহিয়াছে তাহার উপর। হাথরসের ঘটনা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামিয়া নাটক করিতেছেন। তিনি অপরাধীদের থেকেও বেশি টার্গেট করিয়াছেন যোগী আদিত্যনাথের বিজেপি সরকারকে। নিজ রাজ্যের বিষয়ে তিনি কিন্তু একেবারে নীরব। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে বরাবরই সরব হইয়াছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। তিনি রীতিমতো পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়া টুইটে লিখিয়াছেন, 'সরাকরি রিপোর্ট অনুযায়ী এই রাজ্যে শুধুমাত্র আগস্ট মাসেই ২২৩ টি ধর্ষণ ও ৬৩৯টি অপহরণ হইয়াছে। ইহাই রাজ্যে নারীহিংসার চিত্র। শৃঙ্খলা ফিরাইবার সময় হইয়াছে এইবার।' রাজ্যপাল মহোদয়ের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে চোখ রাখিলে পরিষ্কার হইবে যে, মুখ্যমন্ত্রীর 'দুধেল গাভী'দের আধিক্য-সম্পন্ন জেলাগুলিতে ধর্ষণ বেশি হইয়াছে।

সুতরাং, রাজনীতি না করিযা ধর্ষণের মতো ব্যাধিকে কীভাবে চিরতরে নির্মূল করা যায় তাহার জন্যই দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ভাবিতে হইবে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে হইলে পথে নামিতে হইবে আর অবিজেপি রাজ্যে হইলে চুপ থাকিতে হইবে তাহা কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। ধর্ষণ নামক এই সামাজিক ব্যাধিকে লইয়া যাহারা রাজনীতি করিতেছেন তাহাদের মুখোশ মানুষ অচিরেই টানিয়া খুলিয়া ফেলিবে।

সুভাষিতম্

বিজেতব্যা লংকা চরণতরণীয়ো জলনিধিঃ
বিপক্ষঃ পৌলস্ত্যো রণভুবি সহায়শ্চ কপয়ঃ।
তথাপ্যেকো রামঃ সকলমবধীদ্‌রাক্ষসকুলং
ক্রিয়াসিদ্ধি সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে।।

পদব্রজে সাগর পার হয়ে শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র বানর সেনার সাহায্যে প্রবল প্রতিপক্ষ রাবণ ও রাক্ষসদের যুদ্ধে পরাজিত করে লঙ্কা জয় করেন। যথেষ্ট উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও মহান লোকেরা এভাবেই কাজে সাফল্য লাভ করেন।

বাবরি মসজিদ মামলায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা আবারও প্রমাণিত হলো

রামানুজ গোস্বামী

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এর কারণ, অত্যন্ত দক্ষতা ও অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে লখনউয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক সুরেন্দ্রকুমার যাদব সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধরে চলে আসা বাবরি ধাঁচা ধ্বংস মামলার চূড়ান্ত রায়দান করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচা ধ্বংস হয়। এক্ষেত্রে পরপর কয়েকটি ঘটনাপ্রবাহ ও সেই সম্পর্কিত বছর বা সালের উল্লেখ করা খুবই আবশ্যক।

১৯৯২, ৬ ডিসেম্বর, বাবরি ধাঁচা ধ্বংস হয়।

২০০৯ : তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে রিপোর্ট দেয় লিবারহান কমিশন।

২০১০ : বিতর্কিত জমি তিন ভাগ করে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

২০১৯ : রামমন্দিরের জমি সংক্রান্ত মূল মামলার চূড়ান্ত রায়দান করে সুপ্রিম কোর্ট এবং জমিতে রামমন্দিরই নির্মিত হবে, এই মর্মে আদেশ জারি হয়।

২০২০ (৩০ সেপ্টেম্বর) : বাবরি ধাঁচা ধ্বংস মামলায় চূড়ান্ত রায়দান করা হয় এবং সমস্ত অভিযুক্তকেই সসম্মানে মুক্তি-প্রদান করা হয়।

গত বছর রামমন্দির সম্পর্কিত বিষয়ে কম-বেশি সকল সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

রামমন্দিরের সেই মামলার ক্ষেত্রে মূল বিচার্য বিষয় ছিল যে, ওই বিতর্কিত জমি কি সত্যই মুসলমানদের, নাকি ওই স্থানই হলো মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান এবং এই ব্যাপারে সমস্ত রকম ভাবে তথ্য-প্রমাণাদি বিচার করে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ওই জমি রামলালার বলেই স্থির করেন এবং ওখানে রামমন্দির নির্মাণের আদেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বছর গত ৫ আগস্ট রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপূজনের পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে এক প্রধান ভূমিকা পালন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রামমন্দিরের ইতিহাস বা বলা ভালো যে, রামমন্দিরের জমি মুসলমানদের থেকে পুনরুদ্ধারের ইতিহাস একেবারে বাবরি ধাঁচা প্রতিষ্ঠা হওয়ার সমসাময়িকই বলা যেতে পারে। সুতরাং এই জমি বিবাদের ইতিহাস প্রায় পাঁচশত বছরের প্রাচীন এবং এই বিবাদ পরবর্তীকালে নানা সময়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রূপও নিয়েছে। হিন্দুরা বারে বারে ওই স্থানে আক্রান্ত হয়েছে, ওই স্থানে যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই মন্দির ছিল তা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন। বহিরাগত ও সাম্রাজ্যবাদী মুঘল শাসক বাবরের আমলে ওই স্থানে মন্দির ভেঙে মসজিদের প্রতিষ্ঠা হয়। বস্তুত, এই ঘটনা মুসলমান রাজত্বকালে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, হিন্দু মন্দির কলুষিত করা তথা হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন করাই ছিল মুসলমান শাসকদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ভারতের যে কোনও প্রান্তেই এই ঘটনা বারে বারে ঘটেছে। তাই রামমন্দিরের পর সারা দেশের অগণিত হিন্দুধর্মাবলম্বীর পক্ষ থেকে জোরালো দাবি উঠেছে মথুরা ও কাশীর বিষয়ে। আমরা আশা করি যে, রামজন্মভূমির মতো ওই সমস্ত স্থানেও আগামীদিনে সনাতন হিন্দু ধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও অধিকার সম্পূর্ণ মাত্রায় সুরক্ষিত হবে এবং বিধর্মীর যাবতীয় ইতিহাস, কুৎসিত কুকীর্তি চিরতরে বিসর্জিত হবে। অবশ্য এটা একেবারেই সত্য যে, এই দেশের তথাকথিত সেকুলার কিছু রাজনৈতিক দল (প্রধানত কংগ্রেসি ও বামপন্থীরা) এবং এদের সমর্থনকারী কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বারে বারেই রামমন্দিরের বিরোধিতা করেছে এবং মুসলমান-তোষণ করে এসেছে। হিন্দু বা হিন্দুত্বের কথা বললেই এরা সাম্প্রদায়িকতার আওয়াজ তোলে; অথচ বিধর্মীরা হিন্দুধর্মের চূড়ান্ত নিন্দা করলে এরা একটা শব্দও করে না। মজার কথা এই যে, এদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই নিজেরা হিন্দু কিন্তু কায়েমি স্বার্থের কারণে এরা হিন্দুত্বকে সমর্থন করে না। তাই প্রথমে রামমন্দির ও পরে বাবরি ধ্বংস মামলায় সমস্ত অভিযুক্তই মুক্তি পাওয়ায় এরা

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের রায় প্রকৃতপক্ষে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়কেই সূচিত করেছে।

খুবই মুশকিলে পড়েছে। কারণ এরা চায় না যে, সনাতন হিন্দু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ আবার তার প্রাচীন গৌরব ফিরে পাক।

গত ৩০ সেপ্টেম্বরের রায়ের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে অশোক সিঙ্ঘলজী ও আরও কয়েজন এই সুদীর্ঘ সময়কালে প্রয়াত হয়েছেন। তাই বত্রিশ জন অভিযুক্তকে এই মামলা ও তৎসংক্রান্ত অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়। বিচারক সমস্ত অভিযুক্তকেই সসম্মানে মুক্তি-প্রদান করেছেন এবং এই সমস্ত নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এই নেতা-নেত্রীদের দ্বারাই বাবরি ধ্বংস হয়েছে, এরূপ কোনও তথ্য-প্রমাণ শুধুমাত্র সিবিআই নয়, কোনও সংবাদমাধ্যমের কাছেও ছিল না। তবুও শুধুমাত্র আরএসএস, বিজেপি বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই ভিত্তিহীনভাবে এদের সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বাস্তবে কিন্তু ঠিক তার উলটো ঘটনাই ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ করসেবকের বহু বছরের পুঞ্জীভূত স্বতস্ফূর্ত রোষই সেদিন বাবরি ধাঁচা ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু এমনটা যে আদৌ ঘটবে, তা নেতৃবর্গ মোটেও আগে থেকে আন্দাজ করতে পারেননি। কারণ বাবরি ধাঁচা অপসারণ ও রামজন্মভূমি আন্দোলন তো সমার্থক এবং তা তো বহু যুগ ধরেই চলে আসছিল। কিন্তু সনাতন হিন্দু সমাজ যেহেতু অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু, তাই হিন্দুরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই বিবাদের একটি সুদৃঢ় ও ন্যায়সঙ্গত সুবিচার প্রার্থনা করে এসেছিল এবং তারা কখনই আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়নি। তাই বাবরি ধাঁচা যদি ভেঙে দেওয়াই উদ্দেশ্য হতো, তবে এই নেতৃবৃন্দ বহু আগেই তা করতে পারতেন। কিন্তু তা মোটেও হয়নি। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত নেতৃবর্গ, যাঁদের অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁরা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার প্রতি নিজেদের আস্থা বজায় রেখেছিলেন। সুদীর্ঘ ২৮ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর তাঁরা আজ সুবিচার পেলেন এবং সমস্ত অভিযোগ থেকেও মুক্ত হলেন।

উল্লেখ্য যে, বিচারক তাঁর রায়ে এই কথা স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, করসেবকদের উস্কানি বা প্ররোচনা দেওয়া, ধাঁচা ধ্বংসের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত থাকা ইত্যাদি কোনো বিষয়েই কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁরা বরং জনতাকে শান্ত ও সংযত থাকারই নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ধাঁচা ভাঙা থেকে আটকাতে বা বিরত করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু জনতার আবেগ, হিন্দুধর্মের প্রতি সেকুলারবাদীদের তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবহেলা সেদিন এক ভাবাবেগ সৃষ্টি করে যা জন্ম দেয় এক ভয়ংকর জনরোষের এবং তারই পরিণতি হলো বাবরি ধাঁচা ধ্বংস হওয়া।

এক্ষেত্রে একটি কথা না বললেই নয়। তা হলো এই যে, রামজন্মভূমি সংক্রান্ত এই যে বিবাদ, তা ব্রিটিশ সরকার জিইয়ে রেখেছিল নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস সরকারও এই বিবাদের নিষ্পত্তি চায়নি শুধুমাত্র মুসলমান ভোটের কথা ভেবে। ঠিক এই কারণেই, সরাসরি কংগ্রেসিরা অযোধ্যার ওই বিতর্কিত স্থানে বাবরি মসজিদকেই সমর্থন করে গিয়েছে, রামজন্মভূমিকে নয়। ভগবান শ্রীরাম এদের কাছে নেহাতই একজন কাল্পনিক চরিত্র আর তাই বহিরাগত মুঘল শাসক বাবরের নামে সৃষ্ট ওই বাবরি মসজিদই ছিল এই সব সেকুলার হিন্দুধর্ম বিদ্বেষীদের কাছে তীর্থস্বরূপ। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থীরা হিন্দুধর্মের সমস্ত কিছুরই বিরোধিতা করে। বলাই বাহুল্য যে, গত বছর নভেম্বরের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এরা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে এবং এটাই বলা যায় যে, ২০১৯ সালের নভেম্বরের সুপ্রিম কোর্টের রায় ভারতে হিন্দুধর্মের তথা হিন্দুত্বের প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধারের শুভ সূচনা করেছে। এরপরে এই বছরে গত ৩০ সেপ্টেম্বরের রায় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের (তথাকথিত কারণ— এরা শুধুই মুসলমানদের সমর্থক, হিন্দুদের নয়; তাই কোনও ভাবেই এরা প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ নয়) একেবারে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে দিয়েছে। এরা এই রায়ে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ তো আবার আদালতের প্রতিই সন্দিহান হয়ে পড়েছে। বলাই বাহুল্য যে, এই রায় ভারতে হিন্দুত্বের নবজাগরণে আরও একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল।

এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন, প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী, প্রবীণ বিজেপি নেতা মুরলীমনোহর যোশী, উমা ভারতী, সাধ্বী ঋতম্ভরা, বিনয় কাটিয়ার, আচার্য ধর্মেন্দ্র দেব প্রমুখ বিশিষ্ট জন। এই বিষয়ে বিচারকের পর্যবেক্ষণ এই যে, এই অভিযুক্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউই সেদিন গম্বুজের উপরে গিয়ে মসজিদের ধাঁচা ভাঙার কাজ করেননি। তাছাড়া এটা তো ঠিকই যে সেদিন ওই স্থলে সমাগত লক্ষ লক্ষ করসেবকের মধ্যে একটি অংশ হয়তো বা এই কাজ করে থাকতে পারে যার সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে বিজেপি, আরএসএস বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোনও নেতারই কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে না। বস্তুত, এই রায় ভারতের বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাকেই সুদৃঢ় করবে এবং একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে, এই রায় সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তা হলো, ''বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙিয়াছে, কিন্তু এই অত্যাচার স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেইখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে'' (বাণী ও রচনা : ৫।১৮৫)। সবশেষে একথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের এই রায় প্রকৃতপক্ষে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়কেই সূচিত করেছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা আমরা তাই আরও একবার উপলব্ধি করতে সমর্থ হলাম এই রায়ের মাধ্যমে। ভারতীয় রাজনীতি, সমাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, জনজীবন প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই রামমন্দির আন্দোলন এক চিরস্মরণীয় অধ্যায় এবং গত বছরের সুপ্রিম কোর্টের রায় ও গত ৩০ সেপ্টেম্বরের রায়ের পর ভারতে যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান তথা হিন্দু নবজাগরণের ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা সত্যই ভগবানের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করে। তাই আজ মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি করে এটুকুই শুধু বলতে হয়—

'জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম।'

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সকলের কল্যাণ করুন, এটাই কাম্য। ■

ধর্ষণ নিয়ে রাজনীতি নেতিবাচক পরিণতিকেই ডেকে আনে

সুজিত রায়

উত্তরপ্রদেশের হাথরস জেলার বুলগড়হি গ্রামের 'নির্ভয়া'র চিতার আগুন নিভে গেছে অনেকদিন আগেই। চড়া রোদের আবহে সৃষ্ট গরম হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে পোড়া চিতার ভস্মও। নির্যাতিতার পরিবারকে ঘিরে এখন অবিরাম গতায়াত রাজনৈতিক নেতাদের। আর বৃহত্তর বলয় ঘিরে ২৪×৭ রাজ্য পুলিশের কড়া নজরদারি।

রাতারাতি খবরে উঠে আসা উত্তরপ্রদেশের ওই কৃষিপ্রধান বুলগড়হি এখন দেশের রাজনীতির এপিসেন্টার। কারণ দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের পর আরও দু-চারটে বলপূর্বক রমণীছেদনের দুর্ঘটনা ঘটলেও কেন্দ্রে মোদী জমানার এমন 'দুঃসময়' সে সময় ছিল না। করোনার দীর্ঘ ৬ মাসের টানা আক্রমণে প্রশাসনের নাভিশ্বাস। অর্থনীতির জগতে এখন উলটপুরাণের গল্পগাথা। আর উন্নয়নের বাতিতে দেশলাই জ্বালাবার লোক নেই। অতএব রাজনীতির সলতে পাকানোর এটাই শ্রেষ্ঠ সময়।

কংগ্রেস থেকে ভীমসেনা, হিন্দি বলয়ের রাজনীতির সংসারের বড়দা, মেজদা, ছোড়দারা সবাই এখন খুব ব্যস্ত। কারণ রাজনীতির খেলায় এমন 'মুরগি' সচরাচর মেলে না। অতএব ঘোলা জলে মাছ ধরেই যাদের দিন গুজরান হয়, তারা এখন খেপলা জাল, ঘুরনি, পলো, ঝাঁঝরি, বর্শা সবকিছু হাতে নিয়ে নেমে পড়েছে শেষ বর্ষার ঘোলা জলে। সবার সামনে যখন অনাহারের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট, যখন দুষ্টগ্রহের রাশিচক্রও বলে দিচ্ছে ২০২৪-এও ঘুরবে না রাজনীতির চাকা তখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা— এই আর কী! যদি দু-চারটে পুঁটি কিংবা মৌরলাও পাতে পড়ে দিল্লির 'নির্ভয়া'র গোটা শরীরটা ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার ঘটনাটা ঘটেছিল কংগ্রেস জমানায়। তখনও সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি। ড. মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী। তখন পাপ্পু বেটা আর পাপ্পু বেটি রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা বঢরার মুখে টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি। কিন্তু

মা-বেটা-বেটি সবাই ফোঁস করে উঠেছিল উন্নাও কিংবা কঠুয়া ধর্ষণকাণ্ডের ঘটনায় কারণ সে সময়টা ছিল মোদী জমানা।

এই যেমন ধরুন পশ্চিমবঙ্গের গত ৯ বছরের ইতিহাস। ২০১১-য় যখন সততার প্রতীক মুখ্যমন্ত্রী ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিংহাসনে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কামদুনি গ্রামের এক নির্জন দুপুরে এক তরুণীকে ছিঁড়ে খেল চার পশু। মুখ্যমন্ত্রী বিশাল পুলিশ ও প্রেসবাহিনী নিয়ে গিয়ে ওই গ্রামের গৃহবধূ তরুণীর প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে তাদের নকশাল, মাওবাদী ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করে পালিয়ে এলেন। এরপর প্রায় একই সময়ে পার্কস্ট্রিটে রাতের অন্ধকারে ধর্ষিতা হলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অর্থাৎ সংখ্যালঘু তরুণী সুজেট। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'ছোটো ঘটনা'। মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের আইপিএস দময়ন্তী সেন যেই বললেন, ধর্ষণের ঘটনাই ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বদলি দময়ন্তী। তাঁর কেরিয়ার তলানিতে।

হাথরসের ঘটনা নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে গোটা দেশে, তখনই মেদিনীপুরের ডেবরায় এক ১৭ বছরের যুবতীকে ধর্ষণ করে খুন করে ধানক্ষেতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের ঘাটালে বাইতিচক গ্রামেও চাষের জমি থেকে উদ্ধার হয়েছে এক ধর্ষিতা মহিলার দেহ। এ ঘটনা দুটি নিয়ে হইচই হয়নি। কারণ রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলি সরকারের শাসানিতে ভয় পেয়ে খবরগুলি চেপে গেছে। ব্যতিক্রম সিপিআই (এম)-এর মুখপত্র গণশক্তি। সেখানে ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়েছে। আনন্দবাজারে বেরোয়নি। কারণ তার বদলে ২ অক্টোবর সেখানে ৩৭টি সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে ঢাউস সাইজের।

সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। যেটা বলতে চাইছি, সেটা হলো— রাজ্যে যখন ছেদিত রমণীর কান্নামেশা চিৎকার আর রক্ত মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের নারী মুখ্যমন্ত্রী ভারতে মোদী-বিরোধী রাজনীতির মুখ হয়ে রাস্তায় হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করতে করতে বাইট দিচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছে করছে, এখনই ছুটে যাবেন হাথরসে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। এটাকে কী বলব? মুখ না মুখোশ? রাজনৈতিক বক্তব্য নাকি নাটকের ডায়লগ? ভুলে গেলেন ম্যাডাম, আপনার দলেরই এক সাংসদ দলের ছেলেদের দিয়ে ঘরে ঘরে রেপ করার হুমকি দিয়েছিলেন?

রাজ্যে যখন ছেদিত রমণীর কান্নামেশা চিৎকার আর রক্ত মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের নারী মুখ্যমন্ত্রী ভারতে মোদী-বিরোধী রাজনীতির মুখ হয়ে রাস্তায় হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করতে করতে বাইট দিচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছে করছে, এখনই ছুটে যাবেন হাথরসে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। এটাকে কী বলব? মুখ না মুখোশ? রাজনৈতিক বক্তব্য নাকি নাটকের ডায়লগ? ভুলে গেলেন ম্যাডাম, আপনার দলেরই এক সাংসদ দলের ছেলেদের দিয়ে ঘরে ঘরে রেপ করার হুমকি দিয়েছিলেন?

আপনাদের ফেলানি বসাককে মনে আছে? সেই মূক ও বধির না খেতে পাওয়া পরিবারের ধর্ষিতা নাবালিকা যাঁকে পাশে নিয়ে বসে পড়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মহাকরণের চেম্বারের সামনে! পুলিশ সেদিন মমতাকে চ্যাংদোলা করে নামিয়ে দিয়েছিল রাস্তায়। তারপর অনেক খুঁজেপেতে দু' বছর পর সেই ফেলানি বসাককে খুঁজে পেয়েছিলাম কোথায় জানেন? ই ইম বাইপাসের দক্ষিণে মাঠপুকুরে একটি ছোটো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হোমে। তার বাচ্চাটার বয়স তখন দেড় বছর। না, বিশ্বাস করুন কিংবা না করুন, মমতা পাশে ছিলেন না। পরে ফেলানি মারা যায় অসুখে, ছেলেটাও। ফেলানির মা তখনও বেঁচে গেঁড়ি-গুগলি ও শাকপাতা খেয়ে।

এরই মধ্যে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে দুটি ১৪ ও ১৬ বছরের নাবালিকা গণধর্ষিতা হয়েছে। একটি মেয়ে লজ্জা ঢাকতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে একটি শব্দও শুনেছেন? উনি কি বলেছেন, ইচ্ছে করছে এখনই রাজগঞ্জে ছুটে যাই? না, বলেননি। বলবেনও না। কারণ রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণ ও মহিলা নির্যাতনের ঘটনা স্বীকার করে নেওয়াটা একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে বেশ অস্বস্তিকর। সেটা আমরা বুঝি।

আমরা এটাও বুঝি, রাজ্যের ঘটনা ঘুষ দিয়ে চেপে রেখে, মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে খবর লুকিয়ে রেখে আপনি কেন হাথরস যেতে চাইছেন। কারণ এই মুহূর্তে ওই বুড়গলহি গ্রামটাই ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভূমি। এপিসেন্টার। ওখানে একবার আপনি যাবেনই। কারণ এখন আপনার শিরে সংক্রান্তি। আগামী বছরের মাঝামাঝি ভোট। বিজেপি ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে আপনাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলানোর জন্য। হাথরসে গিয়ে 'দলিত রাজনীতি'টা একটু পাকিয়ে দিয়ে আসতে পারবেন অন্তত। বিশেষ করে এখন যখন পাশে নিয়ে হাঁটছেন দলিত 'সাহিত্যিক' মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে। হাথরসে অপরাধী জেলাশাসক প্রবীণ কুমারকে বকাঝকা করে

গরমাগরম বাইটও 'লাইভ' হয়ে যাবে মিডিয়ায়। দু-চারটে ভোট তো বাড়বে। ভারতীয় রাজনীতির সমস্যাটা এখানেই। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের যথাযথ দায়বোধসম্পন্ন রাজনীতির অভাব। না, ধর্ষণের মতো অপরাধকে সমর্থন করবে না কোনো চরম মূর্খও। না, কোনো চরম অমানবিক মুখও প্রকাশ্যে বলবেন না যে, তিনি ধর্ষণের সমর্থক। বরং সুস্থ সমাজের লক্ষণ হলো, মানুষ ধর্ষণের প্রতিবাদ করবে। ধর্ষণের শাস্তি চাইবে। যথাযথ ব্যবস্থা যদি প্রশাসন না নেয়, তাহলে বিক্ষোভ হবে, আগুন জ্বলবে, সরকারের বিরুদ্ধে মামলা হবে। সেখানে রাজনীতিটা থাকবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বদনসিব। এ রাজ্যের বিরোধী শিবির চিরকালই তৎপর মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করতে। বিশেষ করে সেই মৃতদেহ যদি হয় কোনও ছেদিত নারীর।

লক্ষণীয়, ধর্ষণ কোনো নব্য আবিষ্কৃত অপরাধ নয়। প্রাচীন গ্রিসের রোমান সাম্রাজ্যেও ঔপনিবেশিক রাজত্বকালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটত অবিরাম। শাস্তিও হতো। ইংল্যান্ডে চতুর্দশ শতকে ধর্ষিতা নারীর প্রিয়জনরাই শাস্তি দিতেন ধর্ষককে তার চোখ উপড়ে নিয়ে অথবা অণ্ডকোষ কেটে নিয়ে। মধ্যযুগে ইউরোপে আবার অনভিজাত (দলিত বলা যাবে?) পরিবারের কোনো সদস্যা ধর্ষিতা হলে সে খবর প্রকাশ্যে আনা হতো না। টাকা দিয়ে পরিবারের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হতো। প্রাচীন গ্রিক মাইথোলজিতে তো দেবতা জিউসের তপ্ত দেহরসে 'উজ্জীবন' করা হয়েছে সুন্দরী দেবী ইউরোপা, গ্যানিমিড, লিডা দ্য লিম্ফকেও। রাজা অয়াদিপাউস তো তাঁর মা-কেও ধর্ষণ করতে দ্বিধা করেননি।

এখন, এই একুশ শতাব্দীতে পৌঁছেও আমরা দেখছি, ধর্ষণের কোনো একাল সেকাল নেই। সেকালে ধর্ষণের প্রকৃতি যা ছিল আজও তাই। এবং ধর্ষণ নিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বেলেল্লাপনাটাও রয়ে গেছে একই স্তরে। কারণ মানুষের মানবিক সত্তার শান কমেছে। বেড়েছে দুবৃত্তায়ন। এবং সেটাও রাজনৈতিক কারণেই। কারণ দুবৃত্তায়ন ছাড়া এখন ভারতের রাজনীতি অর্থহীন। ভারতবর্ষের দীর্ঘ রাজনীতির ইতিহাসে তাই বিরোধী রাজনীতির চাপন উতোরের খেলাটাই মূল উপাদান হয়ে উঠেছে।

ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে ওই মানসিক রোগটিকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। আর বাড়তে দেবেন না। আপনার, আমার, আমাদের সকলের সচেতন প্রচেষ্টাই নির্মূল করতে পারে ওই ভয়াবহ মানসিক রোগের সমস্ত ভাইরাসকে।

না, যোগীরাজ আদিত্যনাথের হয়ে কোনো সাফাই গাইছি না। না, ধর্ষণের ঘটনা চাপা দিতে কোনো নতুন থিওরি আবিষ্কার করছি না। একথাও বলছি না, ধর্ষণ ঠেকাতে কন্যার বাবা-মা-কে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। এগুলো মুর্খেরা বলবেন। শিক্ষিত সমাজ বলবে না। শিক্ষিত সমাজ চাইবে— সমাজের সবচেয়ে কলঙ্কিত অপরাধ ধর্ষণ সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাক। সমাজের লক্ষ্মীরা সম্মান নিয়ে বাঁচুন। সেই সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ সোচ্চার হন— ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধ নিয়ে বন্ধ হোক নিম্নস্তরের বিরোধী রাজনীতি। বন্ধ হোক, জাতপাতের প্রশ্ন তুলে ধর্ষণ নামক অপরাধটাকেই এড়িয়ে যাওয়ার সব ন্যাক্কারজনক প্রচেষ্টা। ধর্ষণ একটা মানসিক রোগ।

বিরোধী রাজনীতিবিদদের অনুরোধ— ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে ওই মানসিক রোগটিকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। আর বাড়তে দেবেন না। আপনার, আমার, আমাদের সকলের সচেতন প্রচেষ্টাই নির্মূল করতে পারে ওই ভয়াবহ মানসিক রোগের সমস্ত ভাইরাসকে। হাথরসে গুড়িয়ার অকালে ঝরে যাওয়া প্রাণটুকু নিয়ে রাজনীতি করবেন না প্লিজ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

টর্চের আলোয় পশ্চিমবঙ্গের হাল-হকিকত দর্শন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

গ্রামের লজ্জাশীলা এক গৃহবধূ প্রতিবেশিনী এক গৃহবধূকে দিনের বেলায় রাস্তার ধারে তাঁর দেওরের সঙ্গে কথা বলতে দেখে ওই গৃহবধূ প্রতিবেশিনীকে বলেছিলেন— ''ওমা! তুই দিনের আলোয় রাস্তার ধারে দেওয়ের সঙ্গে কথা বললি? তোর কি কোনো লাজ-লজ্জা নেই? আমি ভাসুরের সঙ্গে একরাত্রি কাটিয়ে কোনোরকমে লজ্জার হাত থেকে বেঁচেছি। আর তুই কিনা দেওরের সঙ্গে কথা বললি, ধিক্ তোকে।'' সবাই আমার কথা বুঝতে পারছেন না তো? তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি।

৩ অক্টোবর কলকাতায় কেউ কেউ টর্চ হাতে পদযাত্রা করেছেন হাথরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে। সেদিন সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেছেন— ''আমার মন পড়ে রয়েছে হাথরাসে। ইচ্ছে করছে এখনই ওখানে ছুটে যাই। কাল আমাদের প্রতিনিধি দলকে ধাক্কা মেরে বার করে দিয়েছে। আমি আজ টর্চ হাতে করে নিয়ে হেঁটেছি। যেভাবে যোগীর উত্তরপ্রদেশে আদিবাসী-দলিত মা-বোনেদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, তার জন্যে এই টর্চের মাধ্যমে নির্যাতিতাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসব।'' তিনি আরও বলেন— '...লজ্জা হওয়া উচিত যোগী সরকারের। মা-বোনেদের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে পারে না, আবার নির্যাতিতার পরিবারকে ভয় দেখাচ্ছেন, সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছেন।' আরও অনেক কথাই তিনি বলেছেন এবং পুজো শুরু হওয়া পর্যন্ত সমস্ত শাখা-সংগঠনকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে বলেছেন।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে উনিশ বছরের এক তরুণীকে গণধর্ষণের পাশাপাশি তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। সেই তরুণীকে প্রথমে জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মঙ্গলবার (২৯.৯.২০) ভোররাতে তার মৃত্যু হয়। যে কোনো রাজ্যে, যে কোনো ধর্ম ও শ্রেণীর মহিলা যদি ধর্ষিত হন তা সবক্ষেত্রেই

পার্ক স্ট্রীটে ধর্ষিতা মহিলা প্রতিবাদে সামিল। পরে অবশ্য তিনি হাসপাতালে মারা যান। (ফাইল চিত্র)

নিন্দাযোগ্য। কখনোই এরকম বর্বরোচিত কাজকে সমর্থন করা যায় না। সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশেই দুষ্কৃতীরা এই জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। সেইমতো উত্তরপ্রদেশেরও এরকম জঘন্য কাণ্ড ঘটাল যা নিন্দার ভাষা নেই।

ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশ সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে একটু দেখে নেওয়া যাক। ঘটনার একদিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার-সহ চারজন পুলিশকে সাসপেন্ড করেছেন। এর দুদিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী দোষীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন যা এক কথায় নজিরবিহীন। অথচ অন্যান্য অনেক রাজ্যেই ধর্ষিতা বা নিহতদের পরিবার সিবিআই তদন্ত চাইলেও তা মেনে নেওয়া হয় না। এমনকী হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেও রাজ্যসরকার নিজের পাপ ঢেকে রাখার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে। এরকম ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। কাজেই হাথরাস কাণ্ডে যোগী আদিত্যনাথ জেলা শাসক ও পুলিশ আধিকারিকদের সাসপেন্ড করে এবং নিজে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি একজন দক্ষ এবং সুশাসকও বটে। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন--- 'রাজ্যের মা-বোনেদের সম্মানের যারা ক্ষতি করে তাদের কোনো ভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে তাদের। যারাই মহিলাদের সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করবে তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করবে। যাতে কেউ দ্বিতীয়বার এমন অপরাধ করার সাহস না পায়।'

হাথরাস কাণ্ডে সমগ্র দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, এতে দোষের কিছু নেই। বরং প্রতিবাদ না হলে দুষ্কৃতীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। আমরা সবাই চাই দেশের যে কোনো প্রান্তেই এরকম লজ্জাজনক ঘটনা ঘটলে তার প্রবল প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো কোনো রাজনৈতিক দল যখন শুধুমাত্র বিরোধিতা করার নামে এবং নিজের পাপ ঢাকা দেওয়ার জন্যে আন্দোলনে নামে তখন বলতে ইচ্ছে করে এতটা ভণ্ডামি না করলেই ভালো হতো। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস থেকে জানা গেছে দেশের মধ্যে ধর্ষণকাণ্ডে রাজস্থান প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। অপরদিকে, রাজস্থানে কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ হাথরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে সবচেয়ে বেশি গলার স্বর চড়িয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থাৎ চোরের মায়ের বড়ো গলা। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসকে সেই লজ্জাশীলা গৃহবধূর সঙ্গে একাসনে বসানো যায় কিনা পাঠকগণ সিদ্ধান্ত নিবেন। যিনি প্রতিবেশিনীর দেওরের সঙ্গে কথা বলাকে নিন্দা করেছেন অথচ তিনি নিজে ভাসুরের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের শাসনকালে একের পর এক যে সমস্ত ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। যেমন--- কলকাতার পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, ঘাটাল, রাজগঞ্জ, মালদা, কালিয়াগঞ্জ, চোপড়া, জলপাইগুড়ি, দুবরাজপুর প্রভৃতি স্থানে। নৈহাটীতে তো ধর্ষণে বিশ্বরেকর্ড করেছে পশ্চিমবঙ্গ। কেননা বিশ্বের কোনো দেশে সত্তর বছরের বৃদ্ধাকে কেউ ধর্ষণ করেছে কিনা আমার অন্তত জানা

নেই। তবে নৈহাটী দেখিয়ে দিয়েছে টর্চের আলোয় আলোকিত রাজ্যে সত্তর বছরের বৃদ্ধা খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীকেও এ রাজ্যের মানবিক মুখের শাসকের পালিত ধর্ষকদের ধর্ষণ করতে বাধে না। আর কোনো তরুণী ধর্ষিতা হলে যখন কোনো দরদি মন্তব্য করেন— 'মেয়েটির চরিত্র খারাপ ছিল' তখন তার উদ্দেশ্যে বলতে ইচ্ছে করে— ছিঃ। আরও আছে। মেদিনীপুরের তমলুকে নাবালিকা বনশ্রী ঘোড়াইকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। তারপর মামলা তুলে নেবার জন্য বনশ্রীর বাবার উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং মারধর করা হয়। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী দলিত কন্যা মণিকা মহাতোকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। দলিত কন্যার পরিবার আজও সুবিচার পায়নি। কোনও দরদি রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী ওই পরিবারের পাশে গিয়ে আজও দাঁড়ায়নি। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জের দলিত তরুণীকে ধর্ষণ করে গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারা হলেও আজ পর্যন্ত সেখানে কেউ টর্চ নিয়ে যাননি। অথচ হাথরাস থেকে কুমারগঞ্জের দূরত্ব প্রায় হাজার মাইল কম। কয়েকদিন আগে ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টায় চন্দ্রকোণা রোডের নবকলাতে সাত বছরের শিশুকন্যাকে নির্যাতন ও যৌন হেনস্থা করে আসাদুল্লা খান (নাদু)। ৩০ সেপ্টেম্বর চন্দ্রকোণা রোডের মাংরুল এলাকার ৩৫ বছরের মহিলাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরেরদিন সকালে চাষের খেতে তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। ডেবরা ব্লকে ৬নং জালিবান্দা অঞ্চলের চণ্ডীপুর গ্রামে এক অজ্ঞাত যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ মাঠের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ৫ অক্টোবর অর্থাৎ টর্চের আলোয় পশ্চিমবঙ্গ আলোকিত হওয়ার ঠিক দুদিনের মাথায় উত্তরদিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের নয়াবস্তি এলাকায় ১২ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়েছে। হলদিয়ায় মা-মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, বারাসত, বসিরহাট, কাকদ্বীপ কাণ্ড ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরও বহু জায়গায় ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা ঘটেছে যা এই স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস তথ্য অনুযায়ী, দেশের মধ্যে ধর্ষণকাণ্ডে রাজস্থান প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। রাজস্থানে কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ হাথরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে সবচেয়ে বেশি গলার স্বর চড়িয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থাৎ চোরের মায়ের বড়ো গলা।

হাথরাস কাণ্ডে দিনের বেলায় যিনি মিছিলে টর্চ জ্বালিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গকে তিনি আলোকিত করে তুলছেন, তিনি কিন্তু ভুলে গেছেন যে দিনের বেলায় টর্চের আলো কোনো প্রভাব ফেলেনা। তাই তাঁকে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একটা কবিতার অংশ মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি— 'যেজন দিবসে মনের হরষে/জ্বালায় মোমের বাতি/আসুগৃহে তার জ্বলিবে না আর/নিশিথে প্রদীপ ভাতি।'

রাজ্যবাসী তাঁর কাছে দাবি করছেন— টর্চের আলোয় পশ্চিমবঙ্গ আলোকিত হওয়ার ঠিক দু'দিনের মাথায় উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরে যে অন্ধকার নেমে এলো সেই অন্ধকার দূরিকরণের জন্য তিনি টর্চ হাতে ইসলামপুরে যাবেন এবং টর্চের আলোয় সেখানকার অন্ধকার দূর করে ইসলামপুরকে আলোকিত করবেন। নচেৎ টর্চের আলো নাটকে পর্যবসিত হবে। ■

With Best Compliments from-

A Well Wisher

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

দিদির বড়ো ভুলো মন, ভুলে যান কামদুনি থেকে উলুবেড়িয়ার ধর্ষিতার কথা

বিশ্বপ্রিয় দাস

দিদিমণি মনে আছে, সেই ২০১৩ সালের ঘটনা। বেশি দূরে নয়। একেবারে কলকাতার কাছেই, মাত্র ২০ কিলোমিটার। বারাসাত থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাম। উত্তর ২৪ পরগনার একটি গ্রামের নাম কামদুনি। সেখানে ২০ বছরের এক কলেজ ছাত্রীর কথা হয়তো সবার মনে আছে, তাও আবার মনে করিয়ে দিই। সেদিন ডিরোজিও কলেজের বিএ ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষের কলেজ ছাত্রীটির সঙ্গে ঘটেছিল এমন এক ঘটনা। একদল পশুর নৃশংস পাশবিক অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাঁর নারীত্ব। যার মূল্য চোকাতে হয়েছিল প্রাণ দিয়ে। দিনটা ছিল ৭ জুন। নিশ্চয় ভোলেননি। আপনার রাজত্বকালে। সেই হতভাগ্য মেয়েটির জন্য আজ যে রকম রাস্তায় আপনি নেমেছেন, সেদিন কি নেমেছিলেন? নেমেছিলেন কি আপনার দলের ছোটো-বড়ো-মেজো নেতা-নেত্রীরা। একথা বলা যাবে না। কেননা এটা যে আপনার রাজত্ব।

একটু কাছাকাছি সময়ের গল্প বলি, ২০১৮ সালের নভেম্বরের ঘটনা। উলুবেড়িয়ার। সেখানে পাশবিকতার বলি এক ১০ বছরের মুক ও বধির কিশোরী। এই সেদিনের ৪২ বছরের মালদার এক বাসিন্দার দীঘাতে যেভাবে নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা নিজের গোপন অঙ্গের ক্ষতবিক্ষত হবার মধ্যে দিয়ে সহ্য করতে হয়েছে। সেটা নিশ্চয় মনে আছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। শিশুটির বয়েস মাত্র ৯। বর্ধমানের শঙ্করিপুরের নবপল্লীর ঘটনা। দিদিকে নিয়ে মা ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে কুকুরের চিৎকারে তাঁদের কী যেন মনে হয়। তারা দেখেন, রক্তাক্ত শিশুটি পড়ে আছে পাশবিকতার চিহ্ন গায়ে মেখে।

কয়েকটা ঘটনার মাত্র উল্লেখ করলাম। শুধুমাত্র আপনার রাজত্বকালে নারী নিরাপত্তার চেহারাটাকে দেখাবার জন্য।

উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার মাধ্যমিক দেওয়া বছর পনেরোর সেই কিশোরীটির কথা বারে বারে মনে আসছে। তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল বটগাছের নীচে, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। তাঁর অপরাধ সে নারী। তাঁকে পাশবিক অত্যাচার সহ্য করার পরও সহ্য করতে হয়েছিল মৃত্যুর যন্ত্রণা।

দিদিমণি, এটা অন্য কোনো রাজ্যে নয়, আপনার রাজ্যে। আজ আপনার সাঙ্গোপাঙ্গরা রাস্তায় নেমেছে। সেদিন কী হয়েছিল। আপনার এক সাংসদ (তিনি আজ স্বর্গীয়) বলেছিলেন, ঘরে লোক ঢুকিয়ে রেপ করাবেন। আপনার ভাইয়ের এই কথায় আপনি বেশ বিব্রত হয়েছিলেন। ২০১৩ সালের একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল এই শিরোনামে যে, কলকাতায় ধর্ষণের সংখ্যা ২০০ শতাংশ বেড়েছে। তারা ওই প্রতিবেদনে একটি পরিসংখ্যান দিয়েছি ২০০৮ সালে হয়েছিল ৩৫, ২০০৯ সালে সেটা ৪২, ২০১০ সালে সেটা কমে হয়েছিল ৩২, ২০১১ সালে সেটাই বেড়ে হয়েছিল ৪২, ২০১২ সালে সেটাই ৬৮-তে পৌঁছায়। যদিও তারপর থেকে সেই অর্থে সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না।

দিদি আপনি রাস্তায় নেমেছেন। একজন নারী হিসেবে, নারীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই পারেন। কিন্তু সেটাকে রাজনীতির ময়দানে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? কেউই এই ধরনের অপরাধকে সহ্য করে না। সবাই চায় অপরাধীর কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি। কিন্তু সেটাকে রাজনীতিতে নিয়ে যাওয়া মানে তো আর এক নারীত্বের লাঞ্ছনা। যেটা আপনি একজন নারী হয়ে আর এক নারীত্বের চরম লাঞ্ছনায় ইন্ধন দিচ্ছেন।

২০১৮ সালের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে রেকর্ডেড নারী ধর্ষণ আমাদের রাজ্যে ১০৬৯। এই পরিসংখ্যান মন গড়া কথা নয়। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। এ বছরই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর অর্থ, আমাদের রাজ্যে সেই অর্থে ২০১৮ সালে প্রতিদিন গড়ে তিনজন ধর্ষিত হয়েছেন। ওই পরিসংখ্যান যারা দিয়েছেন, তারা এও বলেছেন, সিংহভাগ ধর্ষণের বিষয়টা প্রশাসনের চৌকাঠের মধ্যেই আসে না। এই সময়ে দুর্জনেরা তাপসী মালিকের বিষয়টা সামনে আনছেন। কেননা আজ আপনাদের সেই সময়ের রাজনৈতিক ট্রাম্প কার্ড এই মৃত্যুর বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। আপনি সিংহাসনে বসে হয়তো নানা কাজের চাপে ভুলে গেছেন পাশবিক অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত দেহটা আগুনে আরও ক্ষতবিক্ষত তাপসী মালিককে।

একটি কথা খুব প্রচলিত। আপনি আচরি ধর্ম অন্যরে শেখাও। দিদি, আপনি আগে আপনার রাজ্যের বিষয়টা দেখুন, তারপর না হয় অন্যেরটা দেখবেন।

হাথরসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি যখন কলুষিত হয়

দেবযানী হালদার

সারাদেশ হাথরস ঘটনায় যত সজাগ, সচেতন, অন্য ঘটনায় তত নয়। দেশে হাজার হাজার ধর্ষণ, খুন, অপহরণ, শিশু ও নারী পাচার হচ্ছে। কিন্তু মিডিয়ার নজর খুব কম ঘটনাতেই পড়ে। রাজনৈতিক সুবিধা আছে যেখানে, সেখানেই সবার গলা শোনা যায়। মিডিয়া তখন নির্বাচিত প্রতিবাদ করে। ইস্যু তৈরি করে আর তার জন্য দরকার হয় কিছু ফ্যাক্টরের। লক্ষ্য বরাবরের মতো একটাই, বৃহত্তর হিন্দু সমাজের ক্ষতি। অথচ এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রথম থেকে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন। হাথরসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নির্যাতিতা মেয়েটির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যোগী আদিত্যনাথ কঠোর সতর্কবার্তা ট্যুইট করে জানিয়েছেন যে যারা উত্তরপ্রদেশে নারীদের আত্মমর্যাদার ক্ষতি করার কথা ভাবছে, তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস অনিবার্য। তিনি বলেছেন যে, এই ধরনের লোকেরা এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মনে রাখবে। এই শাস্তি উদাহরণ স্থাপন করবে। উত্তরপ্রদেশ সরকার মা ও কন্যাদের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আবও বলেন যে এটি আমাদের সংকল্প এবং প্রতিশ্রুতি। পুলিশের গাফিলতিতে মেয়েটির মৃতদেহ বাড়ির লোকের আপত্তি সত্ত্বেও রাত্রিবেলা শেষকৃত্য করা হয়— এই অভিযোগের ভিত্তিতে সাতজন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের তদন্তের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ প্রথমে নার্কো টেস্ট ও পরে সিবিআই তদন্তের

এই প্রতিবাদে বিজেপি বিরোধিতা তো বোঝা যায়। বোঝা যায় নির্বাচনের ইস্যু তৈরি করতে কংগ্রেসের মরা গাঙে জোয়ার আনার মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু দলিত ও উচ্চবর্ণ ফ্যাক্টর বুঝতে গেলে কমিউনিজম বুঝতে হবে। আসলে ক্লাস না থাকলে ক্লাসলেস সোসাইটি গড়ার জন্য বিপ্লব সম্ভব নয়। কাজেই জাতিভেদ প্রথা টিকিয়ে রাখতে বামপন্থীরা ঠিক ততটাই সচেষ্ট যতটা কংগ্রেস গরিবি টিকিয়ে রেখেছিল গরিবীহঠাও অভিযান সফল করতে।

বিরোধিতা করে মেয়েটির পরিবার। অথচ অভিযুক্তদের পরিবার চাইছে। এও বেশ আশ্চর্য ঘটনা।

হাথরসের ঘটনা বেশ অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রতিদিন নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে। তবে এই ঘটনা দেশের অন্য নৃশংস ঘটনার মতো নয়। পার্থক্য আছে। আর আছে বলেই বিশ্লেষণ করলে এর ঘটনা প্রবাহে অসামঞ্জস্য বোঝা যায়। এই ঘটনায় কোনো গোপন কারণে বারবার নির্যাতিতা, মা ও ভাইয়ের জবানবন্দি বদলে যায়। ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটার সময় থানায় যে এফআইআর করা হয়েছিল তাতে মেয়েটির ভাই একটি মাত্র ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল যে মেয়েটির ওড়না সন্দীপ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে গলা টিপে ধরে। আর সেই জন্য মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে যায়। সেই আঘাত এতটাই নৃশংস ছিল যে ঘাড়ের হাড় ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে সেই কারণেই তার মৃত্যু হয় বলে মনে করা হচ্ছে।

মেয়েটির বয়ান ২২ তারিখের আগে পাওয়া যায়নি, কারণ মেয়েটির অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক ছিল যে তার জ্ঞান ছিল না। ২২ তারিখ খুব সামান্য জ্ঞান ফিরলে প্রথমে বয়ানে সেই একই কথা বলে যে একটি ছেলে সন্দীপ যে স্থানীয় ঠাকুর সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের , সে তার গলায় ওড়না দিয়ে তাকে মারবার চেষ্টা করে। এই একই বয়ান দেয় মেয়েটির মা যে সকালে মাঠে ঘাস কাটতে গেলে মেয়েটি যখন মায়ের থেকে এগিয়ে যায়, সেই সময় সন্দীপ তার গলা টিপে মারবার চেষ্টা করে। এবং এও বলে যে ১৬ বছর আগে তার শ্বশুরকে ওই একই পরিবারের লোক খুন করেছিল। দুই পরিবারের বহু বছরের শত্রুতা। ১৫ তারিখের খবরের কাগজেও এই একই কথা দেখা যায় যে দুই পরিবারের নিজেদের শত্রুতা থেকে এই নৃশংস হামলা হয়েছিল। এরপর মেয়েটির বয়ান, তার মা এবং ভাইয়ের বয়ান ক্রমাগত বদলাতে থাকে। পুলিশের এফআইআর-এ প্রথম যে নাম দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তীতে সেখানে আরও তিনজনের নাম যোগ করা হয় এবং গণধর্ষণের কথাও জুড়ে দেওয়া হয়। এবার

টুইটারে 'জাস্টিস ফল' বলে এই রাজ্যের মেয়েদের জন্য লেফট লিবারেল কেন যে কখনো ট্রেন্ড করল না, এটাও বড়ো রহস্যের বিষয়। তবে কি এই রাজ্যের মেয়েদের যন্ত্রণা ও উপলব্ধি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মেয়েদের থেকে আলাদা হয়?

আসা যাক মেডিক্যাল রিপোর্টে। ঘটনার পর মেয়েটিকে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির জেএন মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হলে সেখানে যে রিপোর্ট হয়, তাতে কিন্তু কোনোরকম ধর্ষণের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তার পর রিপোর্টে যৌন নির্যাতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি রিপোর্টই একই হাসপাতালের । পেনাইল পেনিট্রেশনের কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু তার আনুষঙ্গিক রিপোর্টে আর কিছুর উল্লেখ করা নেই। পোস্টমর্টেম ও পরে ফরেনসিক রিপোর্টে কোথাও ধর্ষণের উল্লেখ করা হয়নি। মেয়েটিকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির সফদরজঙ্গ হসপিটালে ভর্তি করা হয় এবং ২৯ তারিখ সকাল বেলায় মারা যায়। ঘটনার পরিবর্তন এর পর থেকে দ্রুতলয় ধরতে থাকে। হঠাৎ বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেখানে যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী সেখানে একটি দলিত সমাজের মেয়েকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গণধর্ষণ করার কথা বারবার বলা হয়। সেই নৃশংসতার জেরে মেয়েটি মারা যায়। এর জন্য ময়দানে নামে ভীম আর্মি প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ, কংগ্রেস পুরো টিম, সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল। এই ঘটনায় যদি মেয়েটিকে গণধর্ষণ নাও করা হয়ে থাকে তবুও সেটি অত্যন্ত নৃশংস অপরাধ যার শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হওয়া উচিত। অভিযুক্ত ঠাকুর পরিবার থেকে এসেছে, না অন্য ধর্ম সম্প্রদায় থেকে এসেছে সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত নয়। ঠিক তেমনই নির্যাতিতা মেয়েটি দলিত বা তথাকথিত নিম্নবর্ণ পরিবার থেকে এসেছে না উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে, সেই হিসেবে অপরাধের গুরুভার নির্ণয় করা উচিত নয়। একটা দলিত মেয়ে হলে তারও যতটা যন্ত্রণা, একটা উচ্চবর্ণের মেয়ে হলে সেই একি যন্ত্রণা, আবার একটি মুসলমানের মেয়ে হলেও তারও একই যন্ত্রণা। যন্ত্রণা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আলাদা হতে পারে না। কিন্তু প্রতিটা মেইনস্ট্রিম মিডিয়া সমানে নির্যাতিতা মেয়েটির আগে 'দলিত' শব্দটি সচেতন ভাবে ব্যবহার করছে। ঠিক তেমনই অভিযুক্তদের আগে 'উচ্চবর্ণ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করছে। এই শ্রেণীই আবার অপরাধী 'মুসলমান' হলে তা উল্লেখ করার বিপক্ষে। অথচ ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ ধর্ষণ হয় সেটাও নজিরবিহীন। কিন্তু সব জায়গায় এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে না। যে মুহূর্তে দেখা হয়ে গেছে যে মেয়েটি দলিত সমাজ থেকে আর অপরাধী উচ্চবর্ণের হিন্দু, ঠিক তখনই ঘটনার মোড় অন্যদিকে নিতে শুরু করে। এখানে বারবার গণধর্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ ঘটনা এতটাই ভয়াবহ যে গণধর্ষণ না হলেও ঘটনার গুরুত্ব কখনই কম হতো না। কিন্তু তবুও ধর্ষণের অ্যাঙ্গেল জুড়ে দিতে পারলে অতি সহজেই সাধারণ মানুষের একটা সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়।

এখানে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কেন তারা তাড়াহুড়ো করে মেয়েটির দাহ সংস্কার রাত্রিবেলাতে করেছে। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, পোস্টমর্টেম

রিপোর্ট হয়ে যাবার পর ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ায় মৃতদেহে পচন ধরতে শুরু করেছিল। কিন্তু অবশ্যই ইচ্ছা থাকলে, চেষ্টা থাকলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারত। মর্গে একেকটা মৃতদেহ ছয়-সাত দিন পর্যন্ত রাখা হয়। এক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারত যখন পরিবার থেকে রাত্রিবেলা দাহ সংস্কারে আপত্তি জানানো হয়েছিল। যদিও একটি ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে যে নির্যাতিতা মেয়েটির দাদু ও বাবার উপস্থিতিতেই তার দাহ সংস্কার হয়েছে এবং তারাই তার মুখে আগুন দেন। অন্য আরেকটি ভিডিয়োতে অদ্ভুতভাবে পুলিশের একটি ছোট্ট বক্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তারা বলছে যে, 'আপনাদের তরফ থেকেও তো ভুল হয়েছিল'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মেয়েটির বাড়ির তরফ থেকে কী এমন ভুল হয়েছিল যেখানে পুলিশ পাড়ার এক উঠোন লোকের সামনে এই কথা বললেও কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না। সবাই চুপচাপ থাকছে। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে, এরা দ্বিতীয় বয়ানে মিথ্যা কথা বলেছিল, যে চারজনের নাম করেছিল, সেটা ভুল বলা হচ্ছে? সেটা ইচ্ছাকৃত কারণ প্রথম তিনটে বয়ান মা, ভাই ও মেয়েটি তিনজনে মিলে একই দেয়। পরবর্তীতে তিনজনেরই বয়ান বদলে গিয়ে চার জন ছেলের নাম আসে এবং গণধর্ষণ যুক্ত হয়ে যায়। এখন কেউ কেউ বলছে প্রথম বয়ান প্রেসারে দিয়েছিল, তারা দ্বিতীয় বয়ান প্রেসারে নয়। এটা বলার কারণ? প্রথম বয়ানটা ভুল কিন্তু দ্বিতীয়বারের গ্রহণযোগ্যতা কতটা? কারণ বয়ান দেওয়া লোকগুলো সেই একই। প্রথম বয়ান সাধারণত যা হয় সেটাই ঠিক থাকে, কারণ সেটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে বেরোয়, কোনো হিসাবনিকাশ থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় বয়ান সাধারণত ভুল হয়, কারণ সেটা দেওয়া হয় সঠিক তথ্য অথবা সত্য গোপনের উদ্দেশ্য নিয়ে। এক্ষেত্রে প্রথমে কোনোরকম ভাবেই গণধর্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়নি এবং একটির বেশি দ্বিতীয় ছেলের উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে কি অন্য কোথাও থেকে প্রেসার এসেছিল? মেয়েটি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মিডিয়ার একটা অংশ ঝাঁপিয়ে

পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ২০১৯-এ মেয়েদের উপরে ঘটে যাওয়া অপরাধের পরিসংখ্যান ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর কাছে জমা দিয়ে উঠতে পারেননি। তাহলে কী ধরে নিতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের উপরে কোনো অপরাধ হয়নি নাকি এত পরিমাণ অপরাধ হয়েছে যে তার পরিসংখ্যান তৈরি করা রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি?

পড়েছে তাদের মধ্যে তনুশ্রী পাণ্ডে অন্যতম। তার একটি অডিয়ো রেকর্ডিং ভাইরাল হয়েছে, সেই রেকর্ডিংয়ে শোনা যাচ্ছে যে মেয়েটির ভাইকে সে বারবার জোর জবরদস্তি করছে একটা ভিডিয়ো তৈরি করার জন্য। সেই ভিডিয়োতে মেয়েটির বাবা বলেন যে, ইনভেস্টিগেশন ঠিকঠাক চলছে বলে তার যে প্রথম বয়ান, সেটা তাকে জোর করে বলানো হয়েছিল। অর্থাৎ কোথাও তো অন্য কোনো খেলা আছে। যেভাবে সমস্ত বামপন্থী লিবারেল, মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট, স্বরা ভাস্কর লাফালাফি করছে তাতে পুরনো ঘটনা পরম্পরা দেখলে স্বাভাবিক তো নয়ই, যথেষ্ট সন্দেহজনক মনে হয়। ধর্ষণ, গণধর্ষণ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে হচ্ছে। অথচ কংগ্রেস হাইকমান্ড থেকে তৃণমূল সাংসদ দলের দেখা কোথাও মেলে না। যে অধীর চৌধুরী এত কষ্ট করে হাথরস দৌড়েছেন, তিনি নিজের জেলায় ধর্ষণে মৃত মহিলার জন্য একটা শব্দও খরচ করেন না।

কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই ঘটনায় অতিরিক্ত সক্রিয়। ২২ সেপ্টেম্বর পুলিশের কাছে রিপোর্ট বদল হয় সোনিয়া ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা শোওরাজ জীবন মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর। কারণ এরপরেই রিপোর্ট বদলে যায়। ২ অক্টোবর কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা বঢরা, রণদীপ সুরজেওয়ালা ও রাহুল গান্ধী হাথরসে আসেন। মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোক জ্ঞাপন করতে গেলে তাদের আটকায় ইউপি পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রতিমা মণ্ডল ও মমতা ঠাকুর হাথরস যাবার চেষ্টা করলে ঘটনাস্থল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে পুলিশ তাদের গাড়ি আটকে দেয়। পরে ভিডিয়ো পাওয়া যায় তাতে শোওরাজ জীবন বাল্মীকি টাকা নিয়ে দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত করছে। সেখানে সে এমনও বলে যে, ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোকজন দলিত বাল্মীকি সমাজের মেয়েদের খারাপ দৃষ্টিতে দেখলে উচ্চবর্ণের লোকেদের হাত কেটে, চোখ খুবলে জেলে যেতেও রাজি। প্রতিটি বক্তব্য দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট, ইচ্ছা করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লির যন্তর মন্তরে ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় একটি বিশাল প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয় ঘটনার ন্যায়বিচার চেয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণ জানতে চেয়ে। এটি বিকাল পাঁচটার সময় ইন্ডিয়া গেটের কাছে হবার কথা থাকলেও পরে তা যন্তর মন্তরে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিটা বিরোধীদল এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন প্রত্যেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বিশেষ করে দাঙ্গা এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজের ভয়ে এলাকায় ১৪৪

ধারা জারি করেছে। যে কারণের জন্য সেখানে শান্তি বিঘ্নিত হবে বলে কাউকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ যাতে ভয়ংকর দাঙ্গা শুরু করা যায় তার সব রকম চেষ্টা ক্রমাগত চলছিল। হাথরস যে কংগ্রেসের মরা গাঙে জোয়ার আনতে পারে তা বুঝতে পেরে ট্যুইট করেন সিনিয়র সাংবাদিক মাধবন নারায়ণন। ট্যুইটে তিনি বলেন যে, হাথরস প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর জন্য ভগবান প্রদত্ত একটি কৌশলগত সুযোগ। পরে বিতর্কিত এই ট্যুইট তিনি ডিলিট করে দেন।

কোনো অপরাধ সেটা যারই হোক না কেন কোনোরকম ভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এই ঘটনা ততটাই নিন্দনীয় যতটা অন্যান্য ঘটনা। এই ঘটনায় যতটা প্রতিবাদ আমি করছি, অন্যান্য ঘটনার জন্যও ততটাই প্রতিবাদ করি। যে ভয়াবহতা, যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ১৯ বছরের একটা মেয়েকে যেতে হয়েছে, তার জন্য কোনো শাস্তি বেশি নয়। কোনো প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়। কিন্তু ঠিক তখনই চোখ চলে যায় বিহারের দিকে। সামনে সেই রাজ্যে নির্বাচন। আর যখনই কোনো নির্বাচনের আশেপাশে এই ধরনের ঘটনা ঘটে, তখন তাকে নির্বাচনী ইস্যু বানাতে এক মুহূর্ত দেরি করে না মিডিয়া ও বিরোধী দল। আমরা দেখেছি তাই আখলাক, রোহিত ভেমুলা ও আসিফার সময় কোনো না কোনো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই নির্দিষ্ট ঘটনাগুলো একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে প্রতিবাদ করা হয়। সেই প্রতিবাদের কম্বিনেশনটা এখানে পাওয়া গেছে কারণ দলিত নির্যাতিতা আর উচ্চবর্ণের হিন্দু অভিযুক্ত; বিজেপি শাসিত রাজ্য আর সামনে বিধানসভা নির্বাচন বিহারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে। কাজেই এর প্রতিবাদ হবে, এর জন্য টুইটারে ট্রেন্ড হবে। এই প্রতিবাদ কীসের জন্য, তদন্ত হচ্ছে না? প্রতিবাদ কীসের জন্য, ইউপিতে মেয়েদের উপরে অপরাধের সংখ্যার কি বৃদ্ধি পেয়েছে? আর যারা প্রতিবাদ করছে তেমনি এক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যার মুখ্যমন্ত্রী ২০১৯-এ মেয়েদের উপরে ঘটে যাওয়া অপরাধের পরিসংখ্যান ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর কাছে জমা দিয়ে উঠতে পারেননি। ওয়েবসাইট খুললেই দেখা যাচ্ছে ২০১৮-র পরিসংখ্যান। তাহলে কী ধরে নিতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের উপরে কোনো অপরাধ হয়নি নাকি এত পরিমাণ অপরাধ হয়েছে যে তার পরিসংখ্যান তৈরি করা রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি? পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোনো অপরাধ ঘটলে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় বিরোধী নেতাদের পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ এরাই হাথরসের মতন অন্য রাজ্যে দৌড়ে যায় প্রতিবাদ করার জন্যে, খবরের শিরোনামে থাকার জন্য, প্রচারের লাভ ওঠানোর জন্য। অথচ এই রাজ্য বানতলা থেকে কামদুনিতে মেয়েদের ধর্ষিতা, নির্যাতিতা, রক্তাক্ত ও মরতে দেখেছে একটার পর একটা নৃশংস ঘটনায়। কিন্তু স্বরা ভাস্করের মতন তারকাখচিত প্রতিবাদ তাদের কপালে জোটে না। প্রিয়াঙ্কা বঢরা থেকে রাহুল গান্ধীর মতন কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সেখানে ছুটে আসে না। প্রতিবাদ করার জন্য তনুশ্রী পাণ্ডের মতন সাংবাদিক যাকে সিএএ বিরোধী মঞ্চে অত্যন্ত সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছিল সেও ছুটে আসে না। কোনো মন্ত্রী, সাংসদ কেউ দাঁড়িয়ে যন্তর মন্তরে সমাবেশ করে ভারতবর্ষের সবাইকে এই রাজ্যের মেয়েদের কথা জানায় না। টুইটারে 'জাস্টিস ফল' বলে এই রাজ্যের মেয়েদের জন্য লেফট লিবারেল কেন যে কখনো ট্রেন্ড করল না, এটাও বড়ো রহস্যের বিষয়। তবে কি এই রাজ্যের মেয়েদের যন্ত্রণা ও উপলব্ধি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মেয়েদের থেকে আলাদা হয়? পশ্চিমবঙ্গের এই মেয়েদের জন্য আওয়াজ তুলতে কেউ নেই কেন? এদের এত নির্বাচিত প্রতিবাদ ও সেই প্রতিবাদ এতটাই বেশি পরিমাণ ক্যালকুলেশন নির্ভর, কম্বিনেশন নির্ভর, পোড়া এই রাজ্যে আমাদের অবস্থা 'হা হতোস্মি'র মতো। দেশের কাছে এতকিছু ঘটনার পরও একটাই বক্তব্য, ধর্ষণ হোক, গণধর্ষণ হোক, যত নৃশংস হত্যা হোক, যে কোনো অপরাধ হোক না কেন, যেন কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। কিন্তু তার পরেও আপনারা একটু চেখের জল বাঁচিয়ে রাখবেন স্যার। ভারতবর্ষে এখনো অসংখ্য অসহায় মেয়ে আছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যারা ভয়াবহ অপরাধের শিকার, তাদের জন্য কাঁদতে হবে।

এই প্রতিবাদে বিজেপি বিরোধিতা তো বোঝা যায়। বোঝা যায় নির্বাচনের ইস্যু তৈরি করতে কংগ্রেসের মরা গাঙে জোয়ার আনার মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু দলিত ও উচ্চবর্ণ ফ্যাক্টর বুঝতে গেলে কমিউনিজম বুঝতে হবে। আসলে ক্লাস না থাকলে ক্লাসলেস সোসাইটি গড়ার জন্য বিপ্লব সম্ভব নয়। কাজেই জাতিভেদ প্রথা টিকিয়ে রাখতে বামপন্থীরা ঠিক ততটাই সচেষ্ট যতটা কংগ্রেস গরিবি টিকিয়ে রেখেছিল গরিবীহঠাও অভিযান সফল করতে। সোশ্যালিস্ট নেহরু তাই শুরু থেকেই জাত ও ধর্মের নামে রাজনীতি করে গেছেন। ইন্দিরাও সেই একই পথের পথিক। তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জাতপাতের রাজনীতির দরকার। অন্যদিকে সঙ্ঘ আজ দীর্ঘ ৯৫ বছর ধরে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কাজেই সেই আদর্শ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিজেপি জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে রাজনীতি করবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই তাকে প্রতিবাদ করতে জাতপাতের রং দেখতে হয় না। এই দেশে যতদিন স্বরা ভাস্কর ব্রিগেড দলিত, উচ্চবর্ণ দেখে লালা ঝরানোর রাজনীতি করবে, ততদিন সামাজিক অবস্থান উন্নত হতে সময় লাগবে। তবে সঙ্ঘের কর্মসূচিতে আদর্শ মেনে যেভাবে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, খুব শিগরিরই এই কৃত্রিম সমাজব্যবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি আসন্ন। আর হাথরসের ঘটনার প্রকৃত সত্য খুব তাড়াতাড়ি সবার সামনে সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে উন্মোচিত হোক, প্রকৃত দোষী শাস্তি পাক কিন্তু নির্দোষী একজনও যেন দুর্ভোগ না ভোগ করে। এবং দাঙ্গার চক্রান্তের অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাজনৈতিক দল ও মিডিয়াকে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। ■

হাথরস কাণ্ড : হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে

অভিমন্যু গুহ

উত্তরপ্রদেশের হাথরসে কী ঘটনা ঘটেছে তা সবারই জানা। মনীষা বাল্মীকি নামে এক তরুণীকে সেখানে গণধর্ষণ করা হয়। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি হন, পরে দিল্লির এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাথরস জেলা পুলিশ প্রথমে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, পুলিশ সুপার ধর্ষণের ঘটনাটিকেই অস্বীকার করে। যদিও উত্তরপ্রদেশ-প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের কড়া মনোভাবে শেষ পর্যন্ত শাস্তি হিসেবে হাথরস পুলিশ সুপার-সহ পাঁচ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যোগী প্রশাসন এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন। ঘটনাটা নাড়া দিয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেও। তিনিও উদ্যোগী হয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে এ ব্যাপারে যাবতীয় কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তারপরেও বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। ভিক্টিমের পরিবার-পরিজন নানা প্রশ্ন তুলতে পারেন, কারণ মনে রাখতে হবে চূড়ান্ত ক্ষতিটা তাদেরই হয়েছে। সেটা সহানুভূতির সঙ্গে নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে, উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের কাছে এই প্রশাসনিক ভরসাটুকু দেশবাসীর রয়েছে। যদিও এর কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না, তবুও যোগী প্রশাসন ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছেন। এখন সমস্যাটা হচ্ছে এটাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন। ভারতবর্ষের রাজনীতির একটা সমস্যা হচ্ছে, এখানে রাজনীতিটাকে রাজার নীতির মতো করে দেখা হয় না, দেখা হয় পলিটিক্সের আঙ্গিকে। তাই এসব ক্ষেত্রে আন্দোলনের নামে যেটা হয় মানুষকে উস্কে দেওয়া, গরিব-বড়োলোক, উঁচু নিচু ভেদাভেদ তৈরি করা ইত্যাদি।

উত্তরপ্রদেশে জাতপাতের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সুযোগে তাকে আরও উস্কানি দেওয়া হবে, এ তো স্বাভাবিক। কারণ ধর্ষিতা ও পরে মৃতা মনীষা বাল্মীকি তথাকথিত দলিত সম্প্রদায়ের এবং ধর্ষকরা তথাকথিত উচ্চজাতির। তথাকথিত শব্দটা এখানে ব্যবহার করতে হলো, কারণ প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে উঁচু-নীচু এই ভেদাভেদ কর্মভিত্তিক; জন্মভিত্তিক নয়। সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের সন্তান যদি জুতো সারানোর কাজ করেন তার কর্মের নিরিখটাই সেখানে প্রাধান্য পেয়ে তিনি চর্মকার বলেই গণ্য হতেন। আবার চর্মকারের সন্তান যদি ব্রহ্মজ্ঞনের অধিকারী হতেন তবে তিনি ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হতেন। প্রাচীন ভারতে এই প্রথা ছিল। এর স্বপক্ষে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রমাণ বিদ্যমান। বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীও এই ধরনের বক্তব্যই উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু ভারতে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো সমস্যা, এখানে দেশীয় মনীষীর তুলনায় মার্কসীয় মতবাদ বেশি গুরুত্ব পায়। যে কার্ল মার্কসের ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে ন্যূনতম ধ্যানধারণা ছিলনা— মুসলমানরা যেমন লুঠতরাজ

গণতন্ত্রে চিৎকার শুভ লক্ষণ হলেও এক্ষেত্রে সুখী হওয়া যাচ্ছে না, অন্তত পূর্বাপর অভিজ্ঞতা সুখের নয়। জাতপাতের এই নোংরা খেলা থেকে হিন্দু সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে।

চালিয়ে শস্য শ্যামলা ভারতের উর্বর জমি দখল করেছিল, তেমনি ভারতের সমৃদ্ধ বৌদ্ধিক ক্ষেত্র দখলের ছক কষেছিলেন মার্কস। পরবর্তীকালে তার চ্যালাচামুণ্ডারা

ইতিহাস রচনার নামে ভারতীয় সংস্কৃতির ঘাড়ে কলঙ্কের বোঝা চাপানোর কী পরিমাণ চেষ্টা করেছিল সবাই তা দেখেছে। যাইহোক, পরে মুসলমান আমলে ভারতীয় সমাজের অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার দরুণ যে সামাজিক ব্যাধি আমাদের সমাজ দেহকে রোগ জর্জরিত করে তোলে তার মধ্যে এই জাতিভেদ প্রথা অন্যতম!

ভারতীয় রাজনীতির এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েই আমাদের জোর গলায় বলতে হবে যে ধর্ষণ হলো চূড়ান্ত অমানবিক ও পৈশাচিক একটি ঘটনা। উচ্চ জাতি-নীচু জাতি ভেদাভেদ করা এখানে চলে না। যারাই ধর্ষণ করে থাকুক, তারাই কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এখানে জাতের ব্যাপারটি আদপেই বিচার্য নয়। ভারতের সংবিধান ও আইন জাতের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করে না।

তা সত্ত্বেও আমরা কী দেখলাম! সোশ্যাল মিডিয়ার কথা ছেড়ে দিন, বাংলায় বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা, প্রথম পাতায় খবর করতে গিয়ে লিখল এই ধর্ষণকাণ্ডে বিজেপি নাকি উচ্চবর্ণের মানুষকে দিয়ে একটি পালটা জনসমাগম করিয়েছে। কিন্তু বিজেপি এই জনসমাবেশ করিয়েছে তার প্রমাণ কোথায়? উদ্দেশ্য স্পষ্ট, বিজেপি-কে উচ্চবর্ণের দল হিসেবে দেগে দিয়ে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটা ভেস্তে দাও। মজার ব্যাপার দেখুন, যখন কোনো সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণ ঘটে তখন এদের কণ্ঠে কাতর আর্তনাদ শোনা যায় 'সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না'। এর থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, মুসলানদের সন্ত্রাসবাদী রূপ যেমন আড়াল করার চেষ্টা হয়, দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যেমন তাদের বিপজ্জনক ভূমিকা ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করা হয়, সব মুসলমান নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু পাকিস্তান-প্রেমী মুসলমানদের যে চিহ্নিত করা দরকার এই সহজ সরল তত্ত্ব বুঝতে না চাওয়ার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অজুহাত থাকে, তেমনি হিন্দু সমাজের বহুধা বিভক্ত এই দৃশ্যটা সুকৌশলে তুলে ধরার চেষ্টা হয় তা এর ফলে বোঝা যায়। এই অ্যাজেন্ডা মার্কসবাদীদের দীর্ঘদিনের, বর্তমান সময়েও তার কোনো হেরফের হয়নি। এটা ধরতে পারলেই আপনি ভারতীয় সেকুলারিজমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারবেন।

দেশভাগ সময়কালীন স্লোগান 'মুসলিম খতরে মে হ্যায়'-এর মতো ইদানীংকালের স্লোগান 'সেকুলারিজম খতরে মে হ্যায়'। কারণ রামমন্দিরের শিলান্যাস ইতিমধ্যেই অযোধ্যায় হয়ে গিয়েছে। রাম ছিলেন কী নেই, এ নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে--- বামপন্থীদের মার্কসীয় মতবাদ নস্যাৎ করে পুরাণ যে ভারতের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ তা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রামমন্দিরকে ঘিরে সারা ভারতের সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠেছে। যে কারণে দু'চার জন বাঙ্গালি বামপন্থী বাদে সারা ভারতের মানুষ, এমনকী বামপন্থীদের এতদিনের দাবার বোড়ে অধিকাংশ মুসলমান রামমন্দিরের পক্ষেই রায় দিয়েছেন, ভারতের মানুষের এই দেওয়াল লিখন পড়তে পেরে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টির মতো একদা রামমন্দির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও সেই স্রোতে গা ভাসিয়েছে। কিন্তু এমনি করলে তো তাদের অস্তিত্বের সংকট হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাবরি ধাঁচার মতো নেহরুর সেকুলারিজমের ধাঁচাও ভেঙে পড়লো বলে।

আসলে আধুনিক ভারতবর্ষে রামরাজত্বের তাৎপর্য অন্যভাবে অনুভূত হচ্ছে! যে রাজত্বে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকবে না, সকল মানুষ সমানাধিকার প্রাপ্ত হবে, সকল মানুষ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে 'আত্মনির্ভর' হতে পারবেন এটাই মূলত রাম রাজত্বের ধারণা। আর রামমন্দির তার প্রতীক মাত্র। দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেই দেশবাসী রামমন্দিরকে দেখেন। তাই 'রামমন্দির চাই না, হাসপাতাল চাই', এই বালখিল্য-সম স্লোগান এখন পরিহাস মাত্র।

এই দেওয়াল লিখন বিরোধীরা পড়তে পারছে বলে কিছু ঘটলে এত চিৎকার চেঁচামেচি এত হইচই। গণতন্ত্রে চিৎকার শুভ লক্ষণ হলেও এক্ষেত্রে সুখী হওয়া যাচ্ছে না, অন্তত পূর্বাপর অভিজ্ঞতা সুখের নয়। হিন্দু সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে। ■

With Best Compliments from-

A Well Wisher

হাথরস কাণ্ডে আদত অপরাধী কে বা কারা?

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনা নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। হাথরসের বুলগড়হি গ্রামের মনীষা বাল্মীকির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একাংশ তাকে 'হাথরসের নির্ভয়া' নাম দিয়ে তা নিয়ে উত্তাল প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৬-৩০-এ দিল্লির সদরজং হাসপাতালে মৃত্যু হয় মনীষা বাল্মীকির। সর্বপ্রথম তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেন প্রিয়াঙ্কা বঢরা। মনীষার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন উত্তরপ্রদেশ সরকারকে। মনীষার মৃত্যু নিয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই টুইট করতে থাকেন অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা। এতসব প্রতিক্রিয়া মনীষার মৃত্যুর ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত শুরু হয়ে যায় যে মনে হতে থাকে এই সমস্ত কিছু যেন পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল। সেই মর্মে টুইট করেছিলাম তৎক্ষণাৎ। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে পরবর্তী দুদিন মিডিয়াতে আর তেমনভাবে শোনা যায় না প্রিয়াঙ্কা বঢরার নাম। পরদিন, ২০ সেপ্টেম্বর হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল বেরোয় কলকাতার রাজপথে। হাতে লেখা অসংখ্য পোস্টার, বিরাট ছাপানো ব্যানার, বড়ো সাইজের ছাপানো পোস্টার, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর লাইফ সাইজ কাট আউট নিয়ে পুরো প্রস্তুতি-সহ মিছিল। মনীষা মারা যাওয়ার একদিনের মধ্যে এমত বিশদ প্রস্তুতি নেওয়া কীভাবে সম্ভব, সে প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছিল। অনুমান করা যাচ্ছিল যে এমন বিশদ প্রতিবাদ মিছিলের প্রস্তুতি হয়তো আগে থেকেই চলছিল। জম্মুর কাঠুয়ায় আসিফা ওয়াকরওয়াল ধর্ষিতা হয়ে মারা যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেমন করে বড়ো বড়ো ছবি দেওয়া পোস্টার-সহ মিছিল বের করা হয়েছিল, ঠিক সেইরকম দ্রুতগতিতে প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছিল মনীষার মৃত্যুর পরেও।

২৯ সেপ্টেম্বর সকালের পর মিডিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর প্রিয়াঙ্কা বঢরা আবার সংবাদমাধ্যমের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন ১ অক্টোবর, দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা। গোটা দেশ ততক্ষণে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে যে বাড়ির লোকের ইচ্ছা ও অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মনীষার মৃতদেহ ৩০ অক্টোবর রাত পৌনে তিনটের সময় জোর দাহ করে ফেলল কেন? মনীষার বাড়ির লোক চেয়েছিলেন দাহকার্য ৩০ অক্টোবর সকালে করতে, কিন্তু কোনো এক দুরভিসন্ধি নিয়েই কি উত্তরপ্রদেশ পুলিশ গভীর রাতে তড়িঘড়ি দাহ করল মনীষার মরদেহ? ধর্ষণের প্রমাণ লোপাট করাই কি পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল? 'ধর্ষক'রা উচ্চবর্ণের আর মনীষা বাল্মীকি 'দলিত' কন্যা— এই কারণে ধর্ষকদের সুরক্ষার্থেই কি মনীষার দেহ তড়িঘড়ি দাহ করে প্রমাণ লোপাট করতে চাইল উত্তরপ্রদেশের সরকার? এমন সব প্রশ্নই সেদিন ছুটে বেড়িয়েছে ভারত-জুড়ে।

কিন্তু ইংরেজিতে বলা হয়, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। সত্যিই মনীষার দেহ খুব দ্রুত বা তড়িঘড়ি দাহ করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের জন্য ঘটনার সময়ানুক্রম আলোচ্য।

মনীষার মৃত্যু হয় ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৬-৩০ মিনিটে আর তার দেহের পোস্টমর্টেম হয়ে দেহ রিলিজের জন্য তৈরি হয়ে যায় সকাল ন'টায়। ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্ট অনুযায়ী মনীষা যখন মারা যায় তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে দুই মহিলা। কন্যার বাড়ির লোক। এএনআই-এর সংবাদ অনুযায়ীও দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে মনীষা যখন মারা যায়, মনীষার বাড়ির লোক তখন হাসপাতালে ছিল। কিন্তু তারপর তাঁরা হাথরসে ফিরে আসেন হাথরসের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সার্কল অফিসারের সঙ্গে। দিল্লির সফদরজং হাসপাতালের বাইরে তখন হাজির হয়েছে আম আদমি পার্টির এক নেতা। প্রশ্নের শুরু এখান থেকে।

বাড়ির মেয়ে রহস্যজনকভাবে মারা

গিয়েছে, তার দেহের পোস্টমর্টেম হয়ে গিয়েছে। সেই মরদেহ সঙ্গে না নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মনীষার বাড়ির লোকেরা কেবল নিজেরা হাথরস ফিরে গেলেন কেন? মনীষার দেহ সফদরজং হাসপাতলে ফেলে রেখে নানা রাজনৈতিক দলকে ধরনা, স্লোগান ইত্যাদি করার সুযোগ কেন করে দিলেন মনীষার বাড়ির লোক? নিজেদের মেয়ের মৃতদেহকে রাজনীতির উপকরণ কেন বানাতে দিলেন তাঁরা? সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সার্কল অফিসার কি তাঁদের সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন? ওঁরা যখন হাথরস ফিরছেনই, তখন মেয়ের দেহ সঙ্গে নিয়েই তাঁদের ফেরা উচিত— এমতো পরামর্শ কি এসডিএম দিয়েছিলেন মনীষার বাড়ির লোককে? যদি দিয়ে থাকেন, তবে মনীষার বাড়ির লোক যে সে পরামর্শে কর্ণপাত করেননি, তার কোনো লিখিত ডকুমেন্ট কি এসডিএম নিজের কাছে রেখেছেন? এই সব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গত যা যথাসময়ে উঠবে। মনীষার বাড়ির লোক, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ও প্রশাসনকে এসবের জবাব দিতে হবে।

মনীষার পোস্টমর্টেম করা দেহ সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সফদরজং হাসপাতালে পড়ে থাকে রাত দশটা পর্যন্ত। তাও কেউ আসে না। কাটাছেঁড়া দেহে ততক্ষণে পচন ধরতে শুরু করা স্বাভাবিক। এ বিষয়েও একটি প্রশ্ন আছে। সফদরজং হাসপাতালে কি মৃতার দেহ মর্গে রেখেছিল? যদি না রেখে থাকে, তবে কেন রাখেনি?

সফদরজং হাসপাতাল মনীষার মরদেহ ফেলে না রেখে রিলিজ করে দিতে চেয়েছিল। বাড়ির লোকের হাতে তুলে দিতে না পারলে শবদেহ নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ হাসপাতাল কোথায় জানায়? পুলিশকে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। মনীষার বাড়ির লোক দেহ নিতে না আসায় মনীষার দেহ হাথরস পুলিশের হাতে তুলে দেয় সফদরজং হাসপাতাল।

আইনি পদ্ধতি অনুযায়ী সফদরজং হাসপাতলের প্রথমে যোগাযোগ করার কথা দিল্লি পুলিশের সঙ্গে, অতপর দিল্লি পুলিশের জানানোর কথা হাথরস পুলিশকে। জানবার পর হাথরস পুলিশের সর্বপ্রথম আইনি কর্তব্য ছিল মনীষার বাড়িতে লিখিত নোটিশ পাঠিয়ে তাঁদেরকে মনীষার দেহ সংগ্রহ করতে বলা। তাঁরা যদি তা করতে আপত্তি করেন তবে তাঁদের সেই আপত্তিও লিখিতভাবে তাদের থেকে নেওয়া এবং সেই লিখিত বয়ান-সহ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানানো যে তাঁরা তাঁদের মেয়ের দেহ নিতে ও দাহ করতে চাইছেন না। অতপর বিষয়টি জুডিশিয়ারির সিদ্ধান্তের আওতায় চলে যেত এবং মনীষার দাহকার্য হতেও পর্যাপ্ত বিলম্ব হতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই পথে চলেনি। সফদরজং হাসপাতালে বা হাথরস পুলিশ এমতো আইনি পদ্ধতি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেনি। তাতে কাজে আইনি পদ্ধতিগত খুঁত কিছু থাকলেও মনীষার সৎকারকার্যে অযথা বিলম্ব হয়নি।

মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল মনীষার অন্তিম সংস্কার পুলিশ করেছিল বলে। অভিযোগ উঠেছিল যে মনীষার বাড়ির লোকের অনুমতি ব্যতীতই নাকি মনীষার দেহ চুপিসারে রাতের অন্ধকারে দাহ করেছিল পুলিশ। এ কথা সত্য যে নিখুঁত আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করলে পুলিশের উচিত ছিল মনীষার মরদেহ মর্গে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করা, যদিও তা অমানবিক হতো। বাপ-মা থাকা সত্ত্বেও মেয়ের দেহ মর্গে পড়ে থাকত অযথা। কিন্তু আইনত সেটি পুলিশের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু তা বলে কাউকে না জানিয়ে চুপিসারে দেহ দাহ করে ফেলা যদি হাথরস পুলিশের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইউপি পুলিশ মনীষার মরদেহ গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেত কেন? দিল্লিতেই কোথাও দাহকার্য সেরে ফেলতে পারত না কি? পুলিশ তেমন কিছু করেনি। রাত দশটার পর মনীষার মরদেহ দিল্লি থেকে নিয়ে পুলিশ যখন হাথরসে বুলগড়হি গ্রামে ঢুকেছে, তখন রাত ১২টা বেজে ৪৫ মিনিট। ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্টার তনুশ্রী পাণ্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশ মনীষার দেহ নিয়ে গ্রামে ঢোকে ঠিক রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এবং তখনই শুরু হয় অশান্তি। পুলিশ মনীষার বাড়ির লোককে বলে দাহকার্যে অংশগ্রহণ করতে, কিন্তু তাঁরা সকালের আগে দাহ করতে রাজি ছিলেন না। অর্থাৎ পোস্টমর্টেম করা দেহ প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর দাহ করার ইচ্ছা ছিল মনীষার বাড়ির লোকের। মনীষার দেহে পচন ধরে গিয়েছিল। পুলিশ সেকথা গ্রামের সকলকে জানায়। গ্রামের অনেকে বলেন যে নিয়মানুসারে দেহ নষ্ট হওয়ার আগেই তার দাহকার্য সম্পন্ন হওয়া দরকার। মনীষার বাবাকে সেই সময় সঙ্গে নিতে সক্ষম হয় পুলিশ। মনীষার বারার উপস্থিতিতেই দাহকার্য সম্পন্ন হয়। তবে ভিডিয়ো সূত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছে রয়েছে। অর্থাৎ মনীষার বাড়ির কোনো লোকের অনুপস্থিতিতে মনীষার অন্তিম সৎকার করা হয়েছে, এমন অভিযোগ সত্য নয়।

মনীষার দেহ সৎকারের সময় তার মা, ভাই এবং অন্যান্য মহিলা বাড়িতে তখন দরজা বন্ধ করে ছিলেন বলে শোনা যায়। সকাল না হওয়া পর্যন্ত মেয়েকে দাহ করতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। তাঁরা চেয়েছিলেন পরদিন সকাল পর্যন্ত শবদেহ তাঁদের বাড়িতে থাকবে। কিন্তু পুলিশ সেই অসম্ভব দাবিতে কর্ণপাত করেনি। ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্টার তনুশ্রী পাণ্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ১২-৪৫ পর্যন্ত মনীষার বাড়ির সব লোককে বুঝিয়ে দাহকার্যে উপস্থিত করানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে হাথরস পুলিশ। মাতব্বরি দেখিয়ে হলেও, পুলিশ তার সামাজিক কর্তব্য এক্ষেত্রে করেছে। নাহলে ১২-৪৫ থেকে ২-৪৫ পর্যন্ত বাকযুদ্ধ করে মনীষার পরিবারজনকে বোঝানোর পরিশ্রম পুলিশ করত না।

আদত প্রশ্ন— পোস্টমর্টেম হওয়ার বহু ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও হাসপাতাল থেকে মনীষার দেহ দিতে তার বাড়ির লোক কেন গেল না? মনীষার বাড়ির লোক, তাদের 'বাড়ির লোক' পরিচয়টির অবব্যবহার করেছিল কিনা, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। মেয়ের মৃতদেহকে পচে গলে যাওয়ার জন্য ফেলে রাখার অধিকার মনীষার বাপ-মায়ের কি ছিল? কয়েকটি মৌলিক সামাজিক প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন। মনীষার বাড়ির লোকের আচরণ থেকে মনে হয়েছে, নিজেদের মেয়েকে তাঁরা তাঁদের জড় সম্পত্তি বলে মনে করেছেন। সে মারা যাওয়ার পর তার

কাটাছেঁড়া, পচন ধরা দেহকে যথাশীঘ্র সম্ভব সৎকার কার্য থেকে বঞ্চিত করার অধিকার শুধু 'বাড়ির লোক' বলেই কি তাঁদের ছিল? নিজেদের 'অধিকার' প্রয়োগ করে মনীষার সৎকারকার্য অযথা ঠেকিয়ে রাখার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন মনীষার পরিবারজন। আমার মতে এটি সামাজিক অপরাধ। কিন্তু মনীষার বাড়ির লোক অবুঝ, দুর্বল মানুষজন। তাঁরা হয়তো এত তলিয়ে ভাবতে পারেননি। পুলিশ সেমতাবস্থায় তাদের সামাজিক ও মানবিক কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে পুলিশ হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত ইনফরমাল। আইনি প্রোটোকল কিছু ক্ষেত্রে মানেনি পুলিশ। তার ফলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার তাঁদেরকে সাসপেন্ড করেছে এবং পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টেরও নার্কোপলিগ্রাফ পরীক্ষার অর্ডার করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অংশবিশেষ কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ কী না এবং পুলিশের এতখানি ইনফরমাল ও মানবিক হতে যাওয়ার আদত কারণ ঠিক কী তা স্পষ্টত বোঝার জন্য নার্কো টেস্টই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

মনীষার ঘটনা ভারতীয় সমাজের সামনে তুলে ধরেছে এক প্রশ্ন। আইন না মানবিকতা? পুলিশের কাছ থেকে কোনটা প্রত্যাশিত। হাথরস পুলিশ মানবিক আচরণ করতে গিয়ে বেআইনি আচরণ করেছে। পুলিশ যদি আইনসম্মত আচরণ করত, তাহলে মনীষার দেহ মর্গে পড়ে থাকত এবং তারও রাজনীতিকরণ হতো। কিন্তু পুলিশের দিক থেকে কোনো পদ্ধতিগত ভুল সেক্ষেত্রে থাকত না। প্রশ্ন— পুলিশের মানবিক আচরণ কি স্বতস্ফূর্ত? নাকি পুলিশের দিক থেকে এই ধরনের বেআইনি অথচ মানবিক আচরণও মূল ষড়যন্ত্রের অঙ্গ? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানার্থে নার্কোপলিগ্রাফ পরীক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

বেদনার বিষয় হলো, যাঁরা মনীষার ও মনীষার বাড়ির লোকের দুঃখে সহানুভূতিশীল হতে পেরেছেন তাঁদের অনেকেই হয়তো মনীষার বাড়ির লোকের নিন্দনীয় দাপুটে আচরণ লক্ষ্যই করেননি। 'বাড়ির লোক'-এর অধিকার প্রয়োগ করে মনীষার দেহকে সম্পূর্ণ পচেগলে যাওয়ার দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। মনীষাকে একজন পৃথক ব্যক্তি হিসেবে নয়, একটি বস্তু-সম্পত্তি হিসেবে ভাবার এমতো প্রবণতাকে নিন্দা করা আমাদের কর্তব্য। পুলিশ পদ্ধতিগতভাবে কিছু বেআইনি কাজ করেছে। কিন্তু মনীষার বাড়ির লোক যা করেছে তা একাধারে বেআইনিও, অমানবিকও। সে বিষয়টি যদি সচেতন নাগরিক সমাজের নজর এড়িয়ে যায়, তবে নাগরিক সমাজের সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত।

মারা যাওয়ার ১৮ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর দাহ করা হয়েছিল মনীষার দেহ। একে কি তড়িঘড়ি দাহ করা বলা চলে? মনীষার বাড়ির লোকের কর্তব্য ছিল ২৯ তারিখেই সূর্যাস্তের পূর্বে কন্যার দাহকার্য শেষ করা। তাঁরা তা করেননি।

ডাক্তারি পরীক্ষা অনুযায়ী মনীষা ধর্ষিতা হয়নি। তার ঘাড়ের হাড়ে ও স্পাইনাল কর্ডে চোট ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর মনীষা যখন পশুখাদ্য সংগ্রহার্থে মাঠে ঘাস কাটতে যায়, তখন কেউ তার ওপর জবরদস্তি করার চেষ্টা করে, মনীষা তাকে বাধা দেয়, ফলে সে মনীষার গলা টিপে ধরে। ঘাড়ে চোট-সহ মনীষাকে প্রথমে ভর্তি করা হয় হাথরস জেলা হাসপাতালে, যেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় আলিগড়ের জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে। ১৪ তারিখ স্থানীয় থানায়

কেবলমাত্র একজনের বিরুদ্ধে (সন্দীপ ওরফে গুড্ডু) এসসি/এসটি আইনের আওতায় মনীষাকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় মনীষার পরিবারের উপর উপদ্রবের অভিযোগও। তারপর, ২২ সেপ্টেম্বর মনীষার পরিবারের তরফ থেকে আরও তিন জনের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ মোট চার জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় মনীষাকে গণধর্ষণের অভিযোগ যে গণধর্ষণ হয়েছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। ১৪ ও ১৯ সেপ্টেম্বরের অভিযোগ নিয়ে সন্দেহ করার মতো আপাতদৃষ্টিতে কিছু না থাকলেও ২২ তারিখ মনীষাকে গণধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়াটি সন্দেহজনক। এই সময় মনীষা আলিগড়ে জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ভর্তি। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে যে গণধর্ষণ যদি ১৪ তারিখেই হয়ে থাকে, তাহলে সে অভিযোগ তাঁরা ১৪ সেপ্টেম্বরেই দায়ের করলেন না কেন? কেন অপেক্ষা করলেন ২২ তারিখ পর্যন্ত? উপরন্তু, ১৪ সেপ্টেম্বর এমন ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে যেখানে মনীষা বলছে যে মনীষার গলা হাত দিয়ে টিপে ধরা হয়েছিল কারণ নিজের ওপর জবরদস্তি করতে সে দেয়নি। চন্দপা থানার পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মনীষার গলা টিপে ধরা হয়েছিল কেন? মনীষা উত্তর দেয়— 'জবরদস্তি নহি করনে দি, তা সু'। অর্থাৎ নিজের ওপর বলাৎকার করতে মনীষা দেয়নি। মনীষার মাও বলেন যে ঘাস কাটতে যাওয়ার পর দু'জনের মধ্যে মারপিট হয়। বলাৎকারের কথা সেদিন মনীষার মা বলেননি। উপরন্তু এইদিন মনীষা ও তার মা দু'জনেই অভিযোগ করেছিল কেবলমাত্র একজনের বিরুদ্ধে (সন্দীপ)। কিন্তু ২২ তারিখে গণধর্ষণের যে অভিযোগটি জমা পড়েযে সেই অভিযোগ অনুযায়ী মনীষাকে টানা হয়েছিল গলায় ওড়না পেঁচিয়ে এবং ধর্ষক ছিল চার জন। প্রশ্ন উঠেছে, মনীষা ও মনীষার মায়ের কোন্ বয়ানটি সত্যি। ১৪ তারিখের? নাকি ২২ তারিখের? আরও প্রশ্ন, মৃত্যুর আগে মনীষা কি মিথ্যে কথা বলে গেল? মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ কি মিথ্যা বলে?

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, মনীষা গণধর্ষণের বয়ান দিয়েছে ২২ সেপ্টেম্বর আর মারা গিয়েছে২৯ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এমন বয়ান মনীষা যখন দিয়েছে, কন্যা তখন জানত না যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে তাকে। এমত বয়ান দেওয়ার ৭ দিন বাদে মারা যায় মনীষা। মনীষা যখন গণধর্ষণের শিকার হওয়ার বয়ান দিয়েছে, তখন সে চিকিৎসাধীন ছিল, কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী ছিল না। সে আর কোনোদিন সুস্থ হবে না, এমন ধারণাও তার নিশ্চয় ছিল না। অতএব মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে মিথ্যা বয়ান দিয়ে গিয়েছে, বিষয়টি এমন নয়। বরং হাসপাতালের শয্যায় শায়িত অসুস্থ মনীষাকে বার বার পাখি পড়ানো হয়েছে এবং ঠেলে দেওয়া হয়েছে তৈরি করা বয়ানে সম্মতি জানানোর দিকে স্পাইনাল কর্ডে আঘাতপ্রাপ্ত অসুস্থ, আচ্ছন্ন মনীষার বয়ানের ভিডিয়োতে শোনা গিয়েছে যে 'ধর্ষণ হয়েছিল? ধর্ষণ হয়েছিল না?' সাংবাদিকের করা এই জাতীয় লিডিং প্রশ্নের মুখে মনীষা শুধু 'হাঁ' বলতে পেরেছে। তৈরি করা বয়ান মনীষাকে দিয়ে স্বীকার নেওয়া হয়েছিল কি? মিডিয়ার তরফ থেকে মনীষার ওপর, মনীষার ভাইয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করার ভিডিয়ো, তাদেরকে পাখি পড়ানোর ভিডিয়ো ও অডিয়ো টেপ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

মনীষার মৃত্যু বহু রহস্যে ঘেরা। বহু প্রশ্ন, বহু সন্দেহ ও গভীর ষড়যন্ত্রের আঁচ এই মৃত্যু ঘিরে। আরও অজস্র তথ্য উঠে আসছে প্রতিনিয়ত। মনীষার দেহকে পরিকল্পিতভাবে ফেলে রেখে, সে দেহকে পচে যেতে দিয়ে তা নিয়ে নারকীয় নোংরা খেলার ছক সাজানো হয়েছিল বলে স্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছে। মনীষার দেহ রাত্রে দাহ করে সে খেলার ছক সাময়িকভাবে বানচাল করতে পেরেছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। লক্ষ লোকের জমায়েত পরিকল্পিত হয়েছিল মনীষার গলিত শবদেহের উপর। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাফিডেভিট দাখিল করে সে তথ্য জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। অনুমান করা যায় যে নিজেদের অজান্তে অথবা অর্থলোভের বশবর্তী হয়ে মনীষার বাড়ির লোকও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ষড়যন্ত্রের শিকার ও অংশীদার দুই-ই হয়ে পড়েছিল। মনীষার মৃত্যুর কারণে মনীষার পরিবারকে পঁচিশ লক্ষ টাকা এক্সগ্রাসিয়া প্রদান করা হবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে— এমতো সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেই মনীষার বাড়ির লোকের ফোন যায় যে, 'পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কমে তাঁরা যেন রফা না করেন। রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা বঢরা তাঁদের বাড়িতে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন। এ বিষয়ে মনীষার পরিবারের পাশে তাঁরা আছেন, থাকবেন'। এমতো সংবাদও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কন্যার জন্য, সমাজের জন্য এর চেয়েও বেশি দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে? জীবিতা কন্যা যা পারল না, মরে গিয়ে বাপ-ভাইদের জন্য কী তা-ই করে গেল মনীষা? তার মৃতদেহ কি তাঁদের হাতে জুগিয়ে গেল বেশ মোটা অঙ্কের টাকা? কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিল সে মরে নাই, মনীষাও কি মরিয়া প্রমাণ করিল সে মূল্যহীন ছিল না? এই দিক থেকেও বিষয়টিকে দেখা জাতীয় মহিলা কমিশনের উচিত। উপরন্তু, তথাকথিত নারীবাদীরা যদি এ প্রশ্ন না তোলেন, তবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে নারীবাদের নামে তাঁরা আদতে ধ্বংসাত্মক সুযোগসন্ধানী। ■

With Best Compliments from-

A Well Wisher

অতিথি কলম

সঞ্জীব বাজাজ

শ্রম আইনগুলি সংস্থার কাজের পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নিরাপদ করবে

কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিলের পরিধি বাড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন উদ্যোগপতি সরাসরি পরিযায়ী শ্রমিককে কাজে নিতে পারবে যতই আগেকার ঠিকাদারের মাধ্যমে নেওয়া শ্রমিকরা কর্মরত থাকুক না কেন।

সম্প্রতি সংসদে পাশ হওয়া শ্রম আইনে কোনো সংস্থার শ্রমিকের বুনিয়াদি প্রয়োজন মিটিয়ে সংস্থাগুলিকে উৎপাদন ও অন্যান্য বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে অর্থনীতিতে পুনরুজ্জীবন ঘটাবে। চলতি অতিমারীর পরিণতিতে ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদি টিকে থাকা ও শ্রমিকের জীবন জীবিকা নিশ্চিত করাই বিপদের মুখে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নতুন চাকরি তৈরি করতে পারার দৃষ্টিভঙ্গি যা কার্যকর করতে নির্দিষ্ট নিয়োগ নীতি ও সংস্থা চালানোর সময়োপযোগী রূপরেখা তৈরি করা ছিল জরুরি। এরই সঙ্গে কর্মীবর্গের সামাজিক নিরাপত্তা ও উপযুক্ত মাইনে নির্ধারণ করাটাও আবশ্যিক শর্তের মধ্যে পড়ে। শ্রম আইনের তিনটি ধারা বহু বছর ধরে সকল পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা ও বক্তব্য শোনার পর গৃহীত হওয়ায় দীর্ঘকালের প্রায় তামাদি ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া কিছু আইন অবলুপ্ত হয়েছে। নতুন সংশোধনীগুলির সম্ভাব্য অভিঘাত উৎপাদন ব্যবস্থায় সময়োপযোগী পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

সরকার, শ্রমজীবী মানুষ ও নিয়োগকর্তা সকলেরই এই মহামারীর মোকাবিলায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা দেখার সঙ্গে কারবার ও চাকরির স্থায়িত্ব উভয়ের দিকেই নজর দিতে হবে। আজকের দিনে কারবারের অগ্রগতি, শ্রমিকের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এমন সংস্কারই ছিল জরুরি। বিশ্বের অন্য দেশগুলির তুলনায় ভারতের ব্যবসার সংগঠনগুলি যুগ যুগ ধরে কর্মীসংখ্যার নিরিখে ছিল ছোটো ছোটো উদ্যোগ। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে কর্মীসংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখার মূলে ছিল কিছু আইনি বাধ্যবাধকতা। সাম্প্রতিক শিল্প সম্পদ আইনে কোড ২০২০ সংস্কার বলে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীসংখ্যা প্রচলিত ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ করতে পারবে। ব্যবসার পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মী কমানো, সাময়িক বসিয়ে দেওয়া বা ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ৩০০ কর্মী পর্যন্ত কোনো সরকারি পূর্বানুমতি লাগবে না। এর ফলে যে কোনো উদ্যোগপতি বিনা ভয়ে তার ব্যবসার আয়তন বাড়িয়ে লোক নিতে পারবে। ২০১৪ সালেই কিন্তু রাজস্থান সরকার রাজ্যে সরকারি অনুমতি বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে কর্মীসংখ্যা ১০০ থেকে বাড়ানোর আইন করেছিল। এর ফলে বহু উৎপাদক সংস্থা রাজস্থানে ব্যাপক হারে ব্যবসা বাড়ায় যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০০-এর থেকে অনেক বেশি কর্মী নেওয়া হয়। যাদের প্রয়োজনে চাকরি থেকে সরকারি অনুমতি ছাড়াই সরানো যাবে। এরপর আরও ১৫টি রাজ্য উল্লেখিত পরিবর্তিত শ্রম আইন প্রবর্তন করে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে অর্থনীতিতে অনিশ্চিত দোলাচলের ফলে এমন বহু কাজ তৈরি হচ্ছে যেখানে নির্দিষ্ট কিছু মাসের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয় যেমন পরিকাঠামো ক্ষেত্র, বস্ত্রশিল্প, খাদ্য ও নানান কৃষিজ পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি। এই বিষয়ে গ্রহণ যোগ্য এবং মেনে নিতে পারবে (পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী) এমন শ্রমিকদেরই প্রয়োজন যারা বাজারের বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে। অবশ্যই এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ শ্রমশক্তিকে বহু সময়ই বেতন সামাজিক নিরাপত্তা, কাজের পরিবেশ, তাদের পক্ষে কল্যাণকর প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে শোষণ করা হয়। একথা সুবিদিত। নতুন আইনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত শ্রমিক কোনো ঠিকাদারের মাধ্যমে আসবে না। নিয়োগপতি সরাসরি তাকে চাকরিতে নেবে। যে কোনো স্থায়ী কর্মীর প্রাপ্য যা কিছু সুবিধে কোম্পানি তাকে দেবে। একজন নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি শ্রমিকও কিন্তু গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী হবে। এমনকী যদি সে কেবল ১ বছরের

জন্যও নিযুক্ত হয়। অথচ স্থায়ী কর্মীর গ্রাচুইটির অধিকার ৫ বছর চাকরি করলে তবেই জন্মায়।

কাজের পরিবর্তিত চরিত্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সংশোধিত আইনে বিনামূল্যে বীমার সুবিধে চা বাগান বা অন্য সমস্ত প্ল্যান্টেশান শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বাৎসরিক নিখরচায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও একটি দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী কমিটি গঠন করার সুপারিশ রয়েছে। আগেকার কেবলমাত্র বিপদসঙ্কুল কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্যতার বদলে এই ব্যবস্থাগুলি সকল কারখানা, খনি, চুক্তি চাষ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বলবৎ হবে। এই ইএসআইসি ও ইপিএফও বিধি এখন থেকে ১০ জন (প্রথম ক্ষেত্রে) ও ২০ জন (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে) চালু করতে হবে। আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। অথচ নারী শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বড়ো অংশীদার হতে পারে। নতুন বিলে নৈশকালীন শিফটেও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিয়ে তাদের সকল ক্ষেত্রে কাজ দেওয়ার অনুমোদন রয়েছে।

কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিলের পরিধি বাড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন উদ্যোগপতি সরাসরি পরিযায়ী শ্রমিককে কাজে নিতে পারবে যতই আগেকার ঠিকাদারের মাধ্যমে নেওয়া শ্রমিকরা কর্মরত থাকুক না কেন। এছাড়া যদি কোনো পরিযায়ী শ্রমিক তার পছন্দের রাজ্যে নিজে থেকে এসে উপস্থিত হয় সেক্ষেত্রে নতুন চালু হওয়া একটি পোর্টালের মাধ্যমে সে নিজেকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে নথিভুক্ত করতে পারবে। এই নথিভূক্তিকরণ খুবই সরল শুধুমাত্র আধার কার্ড থাকলেই হবে।

কোনো সংস্থা তার লাইসেন্স বাতিল বা কারবার গোটাতে চাইলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানাতে হবে যে সমস্ত শ্রমিককে তাদের প্রাপ্য অর্থ সঠিকভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ব্যবসা

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ধরনের কর্মীদের ক্ষেত্রেই কর্মজীবনের গোটা সময়কাল ধরেই নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলার সুযোগ রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা বৃদ্ধির ক্রমিক প্রক্রিয়া চালু রাখতে একটি ফান্ড খোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিত্য পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও কাজের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে রপ্ত ও আপ টু ডেট রাখতেই এই ব্যবস্থা।

বন্ধে কোনো শ্রমিক না বঞ্চিত হন। ব্যবসার কাজকর্ম নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে নজরদারি করার ব্যবস্থা থাকায় মুখোমুখি দেখা ও দুর্নীতির অবকাশ কমে যাবে। নবগঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশান কোড ২০২০ অনুযায়ী কোনো ধর্মঘট বা মালিকের তরফে 'লকডাউন' ঘোষণার ক্ষেত্রে ১৪ দিনের আগাম নোটিশ যে কোনো পক্ষকেই দিতে হবে। এর ফলে উভয়পক্ষ পারস্পরিক ভাবে যদি নির্দিষ্ট কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় তার চেষ্টা করতে পারে। স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ধরনের কর্মীদের ক্ষেত্রেই কর্মজীবনের গোটা সময়কাল ধরেই নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলার সুযোগ রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা বৃদ্ধির ক্রমিক প্রক্রিয়া চালু রাখতে একটি ফান্ড খোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিত্য পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও কাজের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে রপ্ত ও আপ টু ডেট রাখতেই এই ব্যবস্থা। এই অর্জিত বাড়তি দক্ষতার ফলে চাকরি এক জায়গায় হারালেও সেই কর্মী নতুন কোনা চাকরির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব বিশেষ দক্ষতার ফলে সুযোগ পেতে পারে।

এই সূত্রে Confederation of Indian Industry (CII)-এর কর্তারা মনে করেন সংশ্লিষ্ট তিনটি সংশোধিত শ্রম আইন—(১) জীবিকাজনিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, (২) সামাজিক সুরক্ষা বিধি, (৩) শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক সংশোধন অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রগতিশীল। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ সন্ধানে এই বিলগুলি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ন্যায়, স্বাস্থ্যবিধি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উপসংহার হিসেবে বলা যায়— এই সংস্কারগুলি বুনিয়াদী প্রয়াজনগুলির নিরসনের লক্ষ্যেই করা হয়েছে— (১) অর্থনীতির পুনরুন্নয়ন, (২) ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলির প্রসারের পথে বাধা অপসারণ, (৩) এই দীর্ঘ উপেক্ষিত প্রাচীন ধারা অবসানের ফলে স্থায়ী না হলেও বহু ক্ষেত্রে ভদ্রজনচিত শর্তে বহু কর্মীর নিয়োগ সম্ভব হতে পারে। একইসঙ্গে মহিলাদের কাজের নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া ও পরিযায়ী শ্রমিককে যথাযথ ভাবে ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী দক্ষ করে তোলা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী।

(লেখক ভাইস প্রেসিডেন্ট, কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ড্রাস্ট্রি)

With Best Compliments from-

A
Well Wisher

শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাজারোপযোগী করাটা সময়ের দাবি; এর বিরোধিতা দুর্ভাগ্যজনক

দেশের কৃষক সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে গৃহীত এই নতুন কৃষি আইনের শুধুমাত্র সস্তা রাজনীতির কারণে বিরোধিতা করা থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিরত থাকবে হবে।

ড. তরুণ মজুমদার

অতি সম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে যাওয়া যুগান্তকারী কৃষি আইন ২০২০ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা অপপ্রচার কৃষক সমাজ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে অযথা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তাদের গঠনমূলক সমালোচনা দেশ তথা সমাজকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা করার যে সস্তা রাস্তা বিরোধীরা নিঃসংকোচে বেছে নিয়েছেন, তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কৃষক নিজের ইচ্ছায় উৎপাদিত শস্য বিক্রি করে বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারলে, রাজ্যের ভেতরে ও বাইরে কৃষিজ উৎপাদনের বাণিজ্য বাধামুক্ত হলে প্রতিবাদ কীসের জন্য? দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী বারংবার আশ্বাস দিয়েছেন যে, বর্তমানে চালু থাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) সরকার কর্তৃক শস্য ক্রয়ের প্রক্রিয়া চালু থাকবে। এই নতুন কৃষি আইন তাকে কোনোভাবেই পরিবর্তন করবে না। তা সত্ত্বেও বিরোধীদের এই সীমাহীন মিথ্যা অপপ্রচার কেন?

বিগত শতাব্দীর সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকের মধ্যে আমরা খাদ্যশস্য-সহ অন্যান্য কৃষি উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছি। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের পর থেকেই কৃষকেরা ক্রমাগত লোকসানের মুখ দেখতে বাধ্য হয়েছেন। বাধ্য হয়ে অনেক কৃষক ভাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। কৃষিতে বিশ্বায়নের ঢল নামার ফলে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কৃষকসমাজকে দিয়ে উন্নত দেশগুলির কৃষিপণ্যের মোকাবিলা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেশের জাতীয় সরকার কৃষির উপর একটি সামগ্রিক নীতি প্রণয়নের কথা ভেবেছিল, যাতে করে কৃষিজ ফলনের পরিমাণের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করে কৃষি পণ্যের গুণগত মান ও কৃষি আয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। এই সাধু উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর প্রখ্যাত কৃষিবিদ, ভারতে সবুজ বিপ্লবের জনক ড. এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে কৃষকদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়।

কৃষকদের সমস্যার গভীরে পৌঁছে তার থেকে নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধান করাই ছিল কমিশনের মূল কাজ। কমিশন তাঁর রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেয় ২০০৬ সালের ৪ এপ্রিল। কমিশনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল— কৃষিকে সংবিধানের রাজ্য তালিকা থেকে যৌথ তালিকায় নিয়ে আসা, উর্বর কৃষিজমিকে শিল্পের জন্য কর্পোরেট সংস্থার কাছে হাতবদল রোধ করা, কৃষি প্রযুক্তি ও তার মার্কেটিংয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা, কৃষিজাত পণ্যের গুণগতমান ও কস্ট-কম্পিটিটিভনেস বৃদ্ধি করা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মেকানাইজড চাষে উদ্বুদ্ধ করা, শস্য উৎপাদনের খরচ কমানো, ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি ও অধিক মুনাফার জন্য যৌথ চাষ, চুক্তি চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, কৃষিপণ্য উৎপাদন খরচের অন্তত দেড় গুণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদান করা, কৃষি মান্ডিগুলিতে কৃষি পণ্য বিক্রি- জনিত কর প্রত্যাহার করা প্রভৃতি।

দুর্ভাগ্য যে, ২০০৬ সালে সুপারিশগুলি জমা হওয়ার পরও কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য সেই অর্থে সঠিক পদক্ষেপ করা হয়নি, পরিবর্তে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধার জন্য এই ইস্যুগুলিকে জাগিয়ে রেখে কৃষকদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করা হয়েছে দিনের পর দিন। উলটে গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনার ফলে চাষের মজুরিগত ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। দরিদ্র ক্ষুদ্র চাষির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার এই দায় কিছুটা হলেও গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনার উপর বর্তায়। অন্যদিকে, ভূমি সংস্কারের নামে কৃষিজমিগুলিকে টুকরো টুকরো করে এবং প্রচুর মালিক তৈরি করে বিকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করা গেছে ঠিকই কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন, দক্ষতা, প্রতিযোগিতা, উৎপাদনশীলতা— এর কোনোটাই বাড়ানো যায়নি। প্রকৃতপক্ষে কৃষি জমির একটি ন্যূনতম আয়তন খুবই প্রয়োজন, নইলে কৃষিতে লাভজনক বিনিয়োগ অসম্ভব। ঢালাও ভরতুকি, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, অঢেল কৃষি ঋণের ব্যবস্থা এতদিনেও ভারতীয় কৃষিকে কেন উৎপাদনশীলতায়, কৃষিপণ্যের গুণমানে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থার সমতুল্য করতে পারল না— সে প্রশ্ন কে তুলবে? আমাদের রাজ্যে অসংখ্য নদী, খাল, বিল, পুকুর, ভেড়ির ন্যায় জলাশয়ের অভাব নেই। তবুও বছরে রাজ্যে যেখানে ৩০ লক্ষ টনেরও বেশি মাছ উৎপাদন হওয়ার কথা, সেখানে হচ্ছে মাত্র ১৬ লক্ষ টন। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার ব্যর্থতা, পড়শী রাজ্য থেকে মাছ আমদানি করতে আমাদের বাধ্য করে। কিন্তু কেন এই অবদার্থতা? আজও যদি প্রশ্ন না তোলা হয় তবে আরও পিছিয়ে যেতে হবে না তো?

শুধুমাত্র ভরতুকি আর সর্বক্ষেত্রে অত্যধিক সরকারি নিয়ন্ত্রণ সস্তা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি ও দুর্নীতিকেই কেবলমাত্র পুষ্ট করে, কৃষির মূল সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান করতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান চাইলে কৃষিকে বাজারোপযোগী করতেই হবে। যূথবদ্ধ কৃষিজমিতে চুক্তি চাষের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তিগত কৌশল, উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই উৎপাদনশীলতা ও ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপণ্যের বিক্রিতেও বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে। ফসলের বৈচিত্র্য আনয়ন, কৃষককে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা, সহজেই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার সুবিধা, খামখেয়ালি প্রকৃতির ছোবলে অনিবার্য লোকসান থেকে ভারতীয় কৃষককে বাঁচাতে চুক্তি চাষ আজ বাস্তবিকই অপরিহার্য।

বর্তমান কৃষি আইনে চুক্তি চাষের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কৃষকদের অগ্রিম চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে উপযুক্ত দামের নিশ্চয়তা আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকবে। দামের অনিশ্চয়তা থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য বীমা ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার চুক্তি বাধ্যতামূলক। ফলত, কৃষক দাম কমে যাওয়ার ভবিষ্যৎ ক্ষতির হাত থেকে মুক্তি পাবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষকের ফসলের মূল্য মেটানো ও কৃষিজ পণ্য তুলে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব থাকবে চুক্তিকারী সংস্থার উপর। যে কোনো রকম বিতর্ক দেখা দিলে, এই বিল অনুযায়ী মহকুমা শাসকের অধীনে গঠিত সালিশি বোর্ড তার মীমাংসা করবে। এই আইনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো চুক্তিতে ফসলের একটি অগ্রিম দাম নির্ধারিত করা থাকলেও বাজারের পরিস্থিতি দেখে কৃষক পরবর্তীতে আরও বর্ধিত দাম আদায় করতে পারবেন।

আইনে পরিণত হওয়া বাজার সংক্রান্ত কৃষি বিলটির সৌজন্যে কৃষক তার উৎপাদিত ফসল স্বাধীনভাবে ইচ্ছেমতো বিক্রি করতে পারবেন এবং একইসঙ্গে এমএসপি-ও চালু থাকবে। কৃষক সমগ্র দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন, কোনো নির্দিষ্ট কৃষিমান্ডিতে কৃষকের হাতে থাকবে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধন সংক্রান্ত কৃষি আইনটির আক্ষরিক অর্থ ধরে অপব্যাখ্যা না করে যদি এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তবে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ফুড চেইন মার্কেটিং, কোল্ড স্টোরেজের মতো পরিকাঠামোতে বেসরকারি বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত হবে। বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে, কৃষিপণ্যের অপচয় নিঃসন্দেহে অনেক কমে যাবে। খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে এই বিধি ভবিষ্যতে অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিতে চলেছে।

ভারতীয় কৃষির এই যুগান্তকারী সদর্থক পটপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক কতিপয় কিছু শকুনদের কুৎসিত ভূমিকা। সস্তা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদগ্র বাসনায় এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কৃষকদের ভুল বুঝিয়ে আন্দোলনে নামাচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে ট্রাক্টর জ্বালিয়ে প্রতিবাদের নামে নোংরামিতে শান দেওয়া হচ্ছে। অথচ যারা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন, তারা বিলক্ষণ জানেন বিগত শতাব্দীর সত্তর-আশির দশকে কৃষক যাতে নিজের জমিতে ট্রাক্টর ব্যবহার করতে না পারেন সেই দাবিতে বামদলগুলোর দেশব্যাপী হিংসাত্মক আন্দোলনের বহর। নিজেদের রাজনীতির স্বার্থে কৃষকের স্বাধীনতার মূল্য এদের কাছে পূর্বেও ছিল না, এখনো নেই। আছে শুধু মিথ্যে লোক ঠকানো 'ভাত-দে' আন্দোলনের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের চিরাচরিত অপপ্রয়াস। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কৃষকের ট্রাক্টর ব্যবহারের স্বাধীনতা হরণের হাস্যকর আন্দোলনে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। ট্রাক্টরের উপর ১৫ শতাংশের বেশি এক্সাইজ ডিউটি এবং অন্যান্য ট্যাক্স ও লেভি ইচ্ছাকৃত বাড়িয়ে তাকে মহার্ঘ করে তোলা হয়েছিল যাতে মাঝারি আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষক ট্রাক্টর কিনতে না পারেন। দেশজুড়ে কৃষক সমাজের থেকে প্রতিবাদ উঠে আসায় বাধ্য হয়ে কেন্দ্র সরকার ১৯৭৬ সালে অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে ১২ অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক্টরের ওপর থেকে এক্সাইজ ডিউটি প্রত্যাহার করে নেন। অথচ বাস্তবে প্রায় সমস্ত ট্রাক্টরের ইঞ্জিন ক্ষমতা ২৫ থেকে ৭৫ এইচ.পি-এর মধ্যে। ভাবতে অবাক লাগে

এক সময় যারা কৃষকদের ট্রাক্টর ব্যবহার করতে দেয়নি, আজ তারা হঠাৎ করে কৃষক দরদি হয়ে উঠেছে।

প্রথিতযশা কৃষি বিজ্ঞানী ড. এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে ২০০৪ সালে কৃষির উপর গঠিত যে জাতীয় কমিশনের সুপারিশগুলিকে মূল আকর ধরে এই নতুন কৃষি বিলগুলি আইনে পরিণত হয়েছে, সেই কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বলিষ্ঠ নেতা ও সর্বভারতীয় কিষান সভার সাধারণ সম্পাদক অনুপ কুমার অঞ্জন। অর্থাৎ যে সুপারিশগুলিকে মূল আধার করে এই নতুন কৃষিনীতি রচিত হলো, সেই সুপারিশে বামপন্থীদের সর্বভারতীয় কৃষক নেতার সম্মতি ছিল। বিস্মিত হতে হয়, সেই বামপন্থীদের আজ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। দ্বিচারিতায় পরিপূর্ণ দেউলিয়া রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত দেশ বিরোধী এই আন্দোলন-আন্দোলন খেলা বামেদের স্বভাবজাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইস্তেহারে কৃষির উপর করা অঙ্গীকারগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে এপিএমসি আইন পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি-সহ বাধামুক্ত কৃষিপণ্যের বাণিজ্য, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তুলে দেওয়া প্রভৃতির কথা বলা হয়েছিল। অথচ আজ জাতীয় কংগ্রেস তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দেশব্যাপী অপপ্রচার চালিয়ে কৃষকদের খেপিয়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত ছেড়ে যদি আমাদের রাজ্যের দিকে চোখ ফেরানো যায়, সেখানেও বাম ও বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের অপরিসীম দ্বিচারিতা লক্ষণীয়। এরাজ্যে বাম আমলেই Frito-Lay-এর হাত ধরে চুক্তি চাষের সূচনা হয়েছিল ২০০৩ সালে। মাত্র ১৪০ জন আলু চাষির প্রায় ৭০০ একর জমিতে শুরু হয়েছিল চুক্তিভিত্তিক আলু চাষ। বর্তমানে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি কৃষক সাফল্যের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক আলু চাষে নিযুক্ত। ২০১৭ সালের মাচ মাসে প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে Frito-Lay-এর সঙ্গে চুক্তি ভিত্তিক আলু চাষে যুক্ত কৃষকেরা আলুর দাম কেজি প্রতি পেয়েছেন ৮ টাকা ৪০ পয়সা করে সেখানে অন্যান্য সাধারণ আলু চাষিরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম পেয়েছেন প্রতি কেজি ৩ টাকা ৪০ পয়সা থেকে ৩ টাকা ৮০ পয়সা। অর্থাৎ প্রতি কেজিতে প্রায় পাঁচ টাকার ফারাক। ২০০৬ সালে আয়োজিত কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইন্দো-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তব্যটি একটু শুনে নেওয়া যাক—"Frito-Lay is a success story in West Bengal. When they started their unit in West Bengal we were sceptical. Initially, they were not satisfied with potatoes produced locally and imported them from other states. But now they are helping farmers produce potato which is of better quality than what is grown in Punjab."

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর দেবযানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সঙ্গে একটি সমঝোতা পত্র সই করে। এর ফলে সংস্থাটি কৃষকদের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক চাষে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট উৎপাদিত কৃষিপণ্য, সমগ্র রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কেএফসি ও পিৎজা হাটগুলিতে সরবরাহ করবে।

এরপরেও নতুন প্রণীত কৃষি আইন, ২০২০ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এই অনাবশ্যক বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানোটা দুর্ভাগ্যজনকই শুধু নয় বরং সমগ্র জাতির পক্ষে চরম ক্ষতিকারক নির্লজ্জ দেশ বিরোধিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের কৃষক সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে গৃহীত এই নতুন কৃষি আইনের শুধুমাত্র সস্তা রাজনীতির কারণে বিরোধিতা করা থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিরত থাকবে এই আশা রাখি।

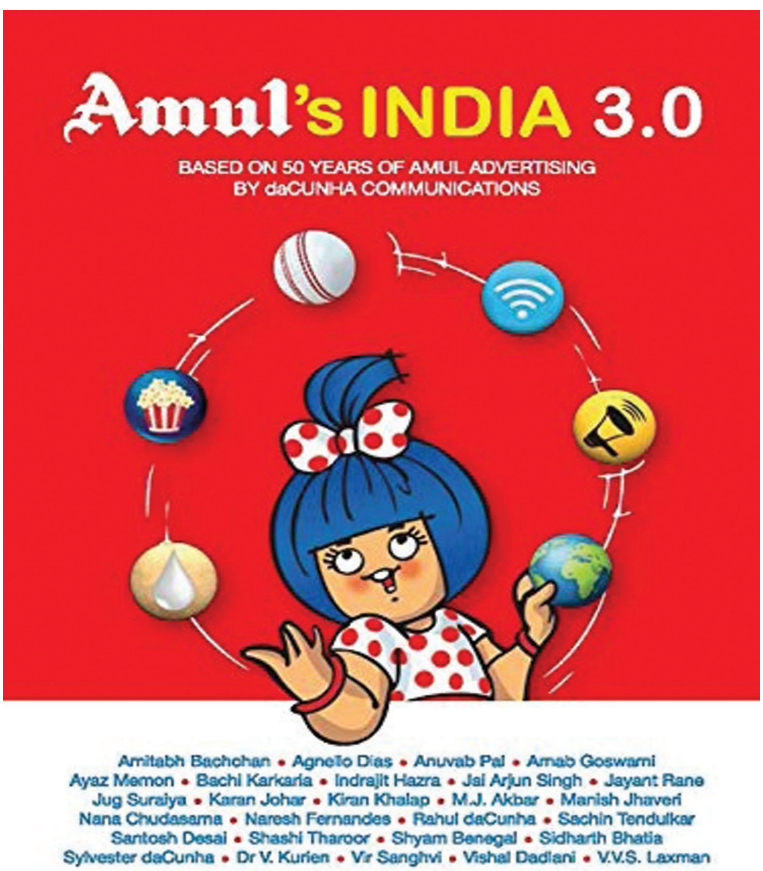

শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষা, ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সফল প্রয়োগ

ড. বিপ্লব পাল

আমাদের মতো বহু ভাষাভাষীর দেশের জন্য এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী ভাষার অন্তর্ভুক্তিকরণ হওয়া প্রয়োজন? তবে এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দেওয়া সহজ নয়। চলুন দেখা যাক এই প্রশ্নের উত্তর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে পাওয়া যায় কিনা। যেহেতু বর্তমানে আমি সুইডেনে থাকি তাই শুরু করছি সুইডেন থেকে। সুইডেনের অধিবাসীরা সুইডিশ ভাষা ছাড়াও ইংরেজিতে বিশেষ পারদর্শী, বিশেষে করে ইয়ং জেনারেশন। তাই আমি যখন প্রথম সুইডেনে আসি মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমি যখন স্পেনে ছিলাম আমার কমিউনিকেশন করতে খুব অসুবিধা হতো, কারণ স্পেনের অধিবাসীরা ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী নন। সইডেন মূলত অর্থনৈতিক কারণে আমেরিকাকে অনুসরণ করে। ১৯৭০ সালের আগে প্রচুর মানুষ সুইডেন থেকে আমেরিকা যেত কাজের খোঁজে। কারণ সুইডেন ৫০ বছর আগে পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল না। বর্তমানে সুইডেনে আমেরিকান সংস্কৃতির প্রভাব খুবই প্রবল। এমনকী এরা সিনেমা হলে হলিউড সিনেমার কোনো ডাবিং করে না, সমস্ত হলিউড সিনেমা ইংরেজিতে দেখানো হয় আর সুইডিশ সাবটাইটেল থাকে।

সুইডেনের সমস্ত সিনেমা হলে আপনি ইংরেজি ভাষায় সিনেমা দেখার সুযোগ পাবেন, যা ফ্রান্স জার্মানি অথবা ইউরোপের অন্যান্য দেশে সহজে পাবেন না। তার মানে এই নয় সুইডিশরা নিজেদের মাতৃভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। সুইডেনের প্রাইমারি এডুকেশন থেকে স্নাতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বিষয় সুইডিশ ভাষায় পড়ানো হয়। তবে স্কুল লেভেল থেকে ইংরেজি এবং আরও একটি ইউরোপিয়ান ভাষা আবশ্যিক ভাষা হিসেবে নিতে হয়। অধিকাংশ সুইডিশ ছাত্র স্প্যানিশ ভাষা থার্ড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে নিয়ে থাকে। আরেকটি বিষয় হলো সুইডিশ ভাষা না জানলে বিদেশিদের পক্ষে সুইডেনে কাজ পাওয়া খুব কঠিন, কারণ সমস্ত ঘরোয়া আলোচনা সুইডিশ ভাষাতেই হয়ে থাকে। বর্তমানে সুইডেন জীবনধারণের মান নির্ণায়ক মাপকাঠিতে বিশ্বের মধ্যে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে যা আমেরিকাও পৌঁছতে পারেনি। অতএব সিদ্ধান্ত হলো অর্থনৈতিক কারণে আমাদের ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি ভাষা অবশ্যই রপ্ত করতে হবে, তবে মাতৃভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

এখন আসি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। ভারতের মতো বহু ভাষাভাষীর দেশে ভাষা নির্বাচন যেমন একটি সমস্যা আবার একটি বিশাল সম্ভাবনাও হতে পারে। তবে আমাদের সুপরিকল্পিত ভাবে ভাষা নির্বাচন করতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে প্রয়োগের জন্য। ইউরোপে এসে আমি অনুভব করেছি যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সমগ্র ইউরোপের সমতুল্য। ২৮টি দেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত যাদের প্রত্যেকের নিজেদের ভাষা ভিন্ন এবং তারা নিজেদের ভাষায় তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। তবে ইউরোপিয়ান দেশগুলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য ইংরেজি ভাষাকে ব্যবহার করে থাকে। ঠিক একই রকমভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা মাতৃভাষায় হলেও আন্তঃরাজ্য কমিউনিকেশনের জন্য সবার বোধগম্য অন্য একটি ভাষা প্রয়োজন। উত্তর ভারতের

উন্নত দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই ভাষা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে। ভারতের মতো বহু ভাষাভাষীর দেশে বিশ্বে সর্বপ্রথম সর্বাধুনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব গড়ে ওঠা উচিত যা বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত হবে।

এক বড়ো অংশের মানুষ বলবেন যে, হিন্দিকে ভাষাকে নির্বাচন করা হোক। কিন্তু সমস্যা হলো দক্ষিণ ভারতীয়রা হিন্দি ভাষার প্রভুত্ব একদম স্বীকার করতে রাজি নয়। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষাকে যদি আন্তঃরাজ্য কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাহলে অনেকাংশে স্বকীয়তা, স্বাদেশিকতা ও জাত্যভিমানের প্রশ্ন চলে আসে। এটা সত্যি কথা যে, বিদেশি ভাষার সঙ্গে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যে চলে আসার সম্ভাবনা প্রবল। এখন মূল্যবান প্রশ্ন হলো যে আমরা স্বকীয়তা ধরে রাখবো না প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের পরিবর্তন করব। এই বিষয়টি নিয়ে আমি বিস্তর ভেবেছি আর আমার মনে হয়েছে দুটোকেই বজায় রাখা সম্ভব। কিন্তু যে পথে এর বাস্তবায়ন সম্ভব সেই পথটি ভীষণ চ্যালেঞ্জিং।

আমার মতে তিনটি ভাষা আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। নিজের মাতৃভাষা, ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা। আমার মনে হয় প্রাইমারি এডুকেশন মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, তবে হাই

স্কুল স্তরের শুরু থেকেই ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচয় হওয়া খুবই প্রয়োজন। আর সংস্কৃত ভাষাকে ভাষা হিসেবে না পড়িয়ে সংস্কৃতির মাধ্যমে শিশুদের মনে গেঁথে দেওয়া সম্ভব। যেমন প্রাইমারি স্কুল ও হাই স্কুলের প্রতিদিনের প্রার্থনার মধ্যে সংস্কৃত স্তোত্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ, স্কুলের কিছু সময় সময় সংস্কৃত সুভাষিত পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি। আমি এক কথায় বলতে চাইছি আমরা যেভাবে হিন্দি সিনেমা দেখে ও গান শুনে হিন্দি শিখেছি ঠিক সেভাবে অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিশুকাল থেকেই সংস্কৃতি তথা সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় করাতে পারি।

সংস্কৃত ভাষার এখনো অর্থনৈতিক দিক না তৈরি হওয়ার ফলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা সংস্কৃত সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় হওয়া খুবই আবশ্যক। তার মানে এই নয় সবাইকে সংস্কৃত ভাষায় সর্বোচ্চ পারদর্শিতা লাভ করতে হবে। আমাদের হাই স্কুলে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এক দৃষ্টি তৈরি হয় যে তারা বুঝতে পারে ভারতবর্ষের সমগ্র ভাষা কীভাবে সংস্কৃত হতে উৎপত্তি হয়েছে এবং কীভাবে ইউরোপিয়ান ভাষাগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ইউরোপিয়ান ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরিসর এখানে নেই, কারণ এটি একটি আলোচনা ও গবেষণার এক বৃহৎ দিক। তবে আমার বক্তব্য সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে না হয়ে অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে হওয়া উচিত। আমরা যদি বিভিন্ন স্কুল- কলেজে ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়ে তুলতে পারি এবং সেখানে বিভিন্ন ডকুমেন্টারির মাধ্যমে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে পারি তাহলে খুব ভালো হয়। এভাবে আমরা ছাত্রদের অধিক সংখ্যক ভাষা শিক্ষার চাপ হতে মুক্তি দিতে পারি।

এবার আসি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর। ইংরেজি ভাষা খুব ভালোভাবে বলতে ও লিখতে পারা বর্তমান বিশ্বে খুবই প্রয়োজন। এখন বিশ্বের সমগ্র লাইব্রেরি লুকিয়ে আছে আপনার স্মার্টফোনের মধ্যে। আর এই লাইব্রেরিকে অ্যাক্সেস করতে হলে ইংরেজি ভাষা জানা খুবই প্রয়োজন। আমার এখন খুব মনে হয় যে স্কুল কলেজে পড়ার সময় আমরা যদি এই অনলাইন লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করার সুযোগ পেতাম তাহলে কোনো কোচিং সেন্টার অথবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। ইংরেজি ভাষা শিক্ষর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী দিক হলো যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক সহজে কাজ পেতে পারে অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে। বিশেষ করে করোনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্ব প্রবলভাবে ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে। তাই আমাদের ছেলে-মেয়েদের অবশ্যই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার পারদর্শিতা খুব ভালোভাবে অর্জন করতে হবে আর এর জন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যিক।

এবার আসি মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তার কথায়। আমি মনে করি আমাদের দেশের ভাষা বৈচিত্র্য এক বৃহৎ সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে। বিদেশে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন ভারতবর্ষে এত ভাষা বৈচিত্র্য তাহলে ভারতবর্ষকে কী করে একটি দেশ বলা যায়। আমি তাদের বলি যখন কোনো ইউনিভার্সিটি খুব গতিশীল হয় তখন ইউনিভার্সিটি হতে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন হয় এবং নতুন নতুন গবেষণার দিক উন্মুক্ত হয় কিন্তু ইউনিভার্সিটি একই থাকে। ঠিক সেইভাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে আমরা এক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। আমাদের হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা দাঁড়িয়েছিল যুক্তি ও বিচারের উপর। তাই আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক ধরনের ভাষা, সংগীত ও শিল্পকলার বিকাশ হয়েছিল এবং এদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক বিবাদ ছিল না বরং তারা এক মূলসূত্রে বাঁধা ছিল।

সবশেষে আমি বলব, যদি আমরা আমাদের দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যকে প্রচণ্ড গতিশীল করে তুলতে পারি তাহলে আমাদের দেশ সমগ্র ইউরোপের মতো একটি প্রগতিশীল দেশ হয়ে উঠতে পারে। যেখানে প্রত্যেকটি রাজ্যের অধিবাসীরা নিজের নিজের ভাষায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হবে, সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে অখণ্ড ভারতীয় চেতনায় পরিপুষ্ট হবে, আর ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করবে। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের ভাষা শিক্ষার পদ্ধতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন দরকার। আমাদের প্রথাগত লেকচার ওরিয়েন্টেড ভাষা শিক্ষার বদলে আরও বেশি করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে হবে যেখানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন ইন্টার-অ্যাকশনের মাধ্যমে সহজেই ভাষা শিখতে পারে। উন্নত দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই ভাষা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমি মনে করি ভারতের মতো বহু ভাষাভাষীর দেশে বিশ্বে সর্বপ্রথম সর্বাধুনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব গড়ে ওঠা উচিত যা বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত হবে। ▮

বর্তমানে হিন্দু অত্যাচারিত ও খুন হলে কোনো কবির কলম গর্জে ওঠে না

বটুকৃষ্ণ হালদার

সাহিত্য শিল্পের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে শিল্পের বা বুদ্ধিমত্তার আঁচ পাওয়া যায়। মোটকথা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য। ধরন অনুযায়ী সাহিত্যকে কল্পকাহিনি বা বাস্তব কাহিনি কিংবা পদ্য, গদ্য এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। পদ্যের মধ্যে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি, গদ্যের মধ্যে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এছাড়াও অনেকে নাটককে আলাদা প্রধান শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। নাটকের মধ্যে নাটিকা, মঞ্চনাটক ইত্যাদিকে গণ্য করা যায়। ঊনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটে এই বাঙ্গলায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার সমাজের মুক্তি ঘটে। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকে। সাহিত্যকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়ে কাটতে থাকে যুগের পর যুগ। লক্ষ্য একটাই ,শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে হবে। উঠে আসে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের নাম। যাঁরা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজকে সংস্কারিত করার প্রয়াস করে গেছেন। জ্ঞানালোকের দ্বারা সতীদাহ প্রথা, বিধবার নির্জলা উপবাস, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের মতো চিরাচরিত কুপ্রথাগুলোর বিলুপ্তি ঘটে এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটে।

তৎকালীন সমাজ সংস্কারকরা জীবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে বদ্ধ সমাজকে মুক্ত করে গেছেন। তাদের মধ্যে সবার প্রথমে যাঁর নাম আসে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'বর্ণপরিচয়' ও 'ধারাপাত' নামক দুটি আকর গ্রন্থ রচনা করেন যাকে অমর সৃষ্টি বলা যায়। এই দুটি গ্রন্থ সমাজের বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বঙ্গপ্রদেশের অহংকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাঙ্গালি হিসেবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য। এরপর বাঙ্গালিদের আর পিছনে ফিরে থাকাতে হয়নি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যের মিলন ঘটাতে লিখেছিলেন, 'মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'। কবি জীবনানন্দ দাশ মাটির গন্ধকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার বাণী শুনিয়েছিলেন। পল্লীকবি জসীমউদ্দীন শুনিয়েছিলেন পরিবেশের আত্মকথা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা আলি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন। প্রত্যেক সাহিত্যিক তাদের নিজস্ব চিন্তাধারায় সমাজের মঙ্গল কামনায় ব্রতী ছিলেন। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতপাত, ধর্মনির্বিশেষে সবার জন্য একই সুরে আহ্বান জানিয়েছেন।

হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে মার খাচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হলেও এসব নিয়ে বর্তমান কবি-সাহিত্যিকদের কলম গর্জে উঠছে না। নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ (?) প্রমাণ করতে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। এটাই হলো বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র।

কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত আধুনিক কবিরা সাহিত্যজগৎকে কলুষিত করে তুলছেন। কবিদের নাম জড়িয়ে পড়ছে নারীঘটিত কাণ্ডে। আবার কোনো কোনো কবি হয়ে পড়েছেন রাজনৈতিক দলদাস। যার ফলে তথাকথিত কবিরা নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলছেন। ভুলে যাচ্ছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। যিনি রাজনৈতিক দলের দাস হয়ে পড়ছেন, তিনি রাজনৈতিক দলের অন্যায়, অবিচারগুলোকেও প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে তথাকথিত এক কবি তাঁর কবিতায় হিন্দুধর্মের ভাবাবেগে আঘাত হেনেছেন। পবিত্র শিবকে টেনে এনেছেন নোংরা অভিসন্ধির খেলায়। সাহিত্যের আঙিনায় পবিত্র শিবের ত্রিশূলকে কলুষিত করে তুলেছেন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষের এরকম কবিতার প্রতিবাদ করা উচিত। প্রতিবাদ হয়েছেও।

তবে এমন লেখাকে সমাজের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন করেছেন। তাঁদের অনেকেরই মত যে ভারতবর্ষের সংবিধান বাকস্বাধীনতার কথা বলে। এক্ষেত্রে যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে আজ হিন্দুরা মহাসংকটে। আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, ইরাক, ইরান সমগ্র বহু মুসলমান অধ্যুষিত দেশে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাকিস্তান বাংলাদেশ বর্তমানে হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। প্রতিনিয়ত এই সমস্ত দেশগুলোতে হিন্দুদের সঙ্গে জানোয়ারদের মতো বর্বোরোচিত ব্যবহার করা হচ্ছে।

এসব নিয়ে তথাকথিত কবিদের কলম

একটিও শব্দ খরচ করছে না কেন আমরা জানতে চাইব না কেউ? আশির দশকের বাংলাদেশের প্রতিবাদী কবি তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশ ছাড়া হলেন। এই সমাজের বুকে অবহেলিত, বঞ্চিত নারীদের নিয়ে তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আজও। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্ব জানে তসলিমা নাসরিনের জীবন যুদ্ধের কাহিনি। কবিরা মানবিক হন, পক্ষপাতিত্ব হীন হন। কিন্তু বর্তমান দলদাস কবি-সাহিত্যিকদের কলম সত্যকথা লিখতে থেমে যাচ্ছে।

মনে পড়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের কথা। মায়ানমারের থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর রোহিঙ্গাদের প্রধান আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ ও ভারত। মায়নমার থেকে প্রায় চার হাজারের মতো রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করা হয়। ইসলামিক দেশ সৌদি আরব তাদের জায়গা দেয়নি। পাকিস্তান তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে, অথচ এই সমস্ত দেশ ভারতবর্ষকে চাপ দিচ্ছে রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত না করার জন্য। সমগ্র মুসলমান দেশ একত্রিত হয়ে রোহিঙ্গা বিতাড়নের প্রতিবাদ শুরু করে। আবার বর্তমানে শান্তিপ্রিয় দেশ সুইডেন এই মুহূর্তে অশান্তির বাতাবরণে কলুষিত হয়ে পড়েছে। যে দেশে অপরাধের লেশমাত্র ছিল না। সেই দেশে হিংসার আগুনে জ্বলছে। সাম্প্রতিককালে সিরিয়া আরব থেকে আগত শরণার্থীদের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে সেখানে আন্দোলন চলছে। শরণার্থীদের স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে সুইডেনে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। এমন বহু শান্তিপ্রিয় দেশে অশান্তির একমাত্র কারণ হলো মুসলমান উদ্বাস্তু শরণার্থীরা। এই কারণে কয়েকটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দেশে কোরান ছিঁড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। অথচ মুসলমান অধ্যুষিত দেশে তাদের জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। চাপ দেওয়া হচ্ছে যেসব দেশে মুসলমানদের চিহ্নমাত্র নেই, শান্তিপ্রিয় দেশগুলিতে। সেই তালিকায় আছে ভারতবর্ষের নাম। এমন উদ্বাস্তুদের সমর্থনে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রাস্তায় আন্দোলন করতে নেমেছে। সমগ্র বিশ্বে হিন্দুদের হাহাকার, প্রকাশ্যে হিন্দু মহিলাদের গণধর্ষণ দেখেও সমগ্র হিন্দু সমাজ চোখে কালো পর্দা দিয়ে রেখেছে। হিন্দু সমাজের চেতনা আজও ফেরেনি। আর এজন্যই হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে মার খেয়ে আসছে। হিন্দুরা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত জেনেও শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। এসব নিয়ে বর্তমান কবি-সাহিত্যিকদের কলম গর্জে উঠছে না। এটাই হলো বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

ভবিষ্যতের ভীতিপ্রদ জৈব মারণাস্ত্র

ডাঃ আর এন দাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগ ও তার ভয়ানক পরিণাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাগাসাকি ('৪৫) ও হিসোসিমার ('৪৫) প্রাণঘাতী পরমাণুবোমার কুফল আমরা দেখেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরও বিধ্বংসী অদৃশ্য শত্রু বিষাণু ও কীটাণুদের কালান্তক প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী মনুষ্যকুল তথা জীবসমূহের বিনাশ হবে অনিবার্য। প্রাচীনকালেও শত্রুদমনে বিষাক্ত বিছা ও সাপ ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রিক কবি হোমার ট্রোজানযুদ্ধে ইলিয়াড ও ওডিসিতে শত্রুনিধনে বিষ মাখানো তির ও বল্লমের উল্লেখ করেছেন। হেরোডোটাসের ইতিহাসে গ্রিকসেনাদের পচাগলা সাপ, পশু বা মানুষের মলমূত্র, শবের রস ও রক্তরঞ্জিত অস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু টিটেনাসের প্রয়োগ এভাবেই হয়েছিল। হাজার খ্রিস্টপূর্বেও শত্রুর জল ও খাদ্যে চূর্ণীকৃত বিষাক্ত ধুতরোর বীজ, রিসিন, আরগট ও সর্পবিষ প্রয়োগের উল্লেখ আছে। কার্থেজের বিজয়ী হ্যানিবল শত্রুরাজা ইউমেনেসের যুদ্ধজাহাজে বিষাক্ত সর্পপূর্ণ পাত্র নিক্ষেপ করে নৌসেনাদের হত্যা করেছিলেন।

মধ্যযুগে মোঙ্গল দস্যুরা ১৩৪৬-তে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্লেগ মহামারীর প্রকোপ ঘটিয়ে, শবদেহগুলি শহরে নিক্ষিপ্ত করে ক্রিমিয়ার 'কাফা' দখল করে। ব্রিটিশসৈন্য ১৭৬৩-তে আমেরিকায় পিট-দুর্গ দখল করে বসন্তরোগের মহামারীতে আক্রান্তদের ব্যবহৃত কম্বল ও রুমাল রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ছড়িয়ে। উদ্ভাবনী শক্তিতে বলীয়ান জার্মানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির ভারবাহী খচ্চর ও ঘোড়াগুলিকে গ্ল্যান্ডার ও অ্যানথ্রাক্স রোগাক্রান্ত করে রসদ ও গোলাগুলির কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করেছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে, ১৯১৫ সালে তারাই অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে আনারস ও লঙ্কার ঝাঁঝযুক্ত ক্লোরিন গ্যাসের ব্যবহার করলেও বিধাতার শাপে দিক্ পরিবর্তিত বায়ু জার্মান সেনাদেরও মৃত্যু ঘটায়।

১৯৫০ সালে রাশিয়ার কমিউনিস্টরা 'বায়োপ্রিপারট' প্রকল্পের মাধ্যমে সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করেছিল ভয়ংকর জৈবজীবাণু আবিষ্কারের জন্য। ১৯৬০ সালে আমেরিকায় ১০০০ কেজি 'রাইস-বাস্ট' ও ৩৬,০০০ কেজি 'হুইট স্টেম-রাস্ট' পাখির পালকে মাখিয়ে আকাশ থেকে উর্বর জমিতে ফেলে ৫০ শতাংশ ফসল ধ্বংস করার পরীক্ষা চালিয়েছিল। ব্রিটেনের মিলিটারি জার্মানির শহরে পশুখাদ্যের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স মিশিয়ে পশুসম্পত্তির বিনাশসাধন করেছিল।

বিগত শতবর্ষে সারাবিশ্বে সংক্রমণে এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিষাণু ও জীবাণুতে ৫০০ মিলিয়নের মৃত্যু হয়। মাঞ্চুরিয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানই প্রথম জৈবযুদ্ধের সূচনা করে। সেজন্য ১৯২৫-এ জেনেভায় এবং ১৯৭২-এ লণ্ডনে আন্তর্জাতিক মঞ্চে, ১৮২টি দেশের সম্মতিতে 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপনস কনভেনশনের' সৃষ্টি হয়।

২০১২-তে ষাটোর্ধ এক সৌদি ধুম জ্বর, সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হলে ভাইরোলজিস্ট ডাঃ এএম জাকি করোনা ভাইরাসের সন্ধান পেয়ে নেদারল্যান্ডের এরাসমাস মেডিক্যাল সেন্টারের প্রোফেসর ফুশিয়ারকে ভাইরাসের নমুনাটি পাঠান। পরে সেই নমুনা চতুর্থ স্তরের সর্বোচ্চ জীবনিরাপত্তাযুক্ত উইনিপেগের ন্যাশনাল মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পৌঁছায়। এখানে ইবোলা, সার্স, করোনা, হান্টা ভাইরাসের গবেষণা হচ্ছিল। ২০১৯-এর প্রথমেই চীনাবংশোদ্ভূত গবেষক সেই নমুনাটিকে পরীক্ষাগারের সুরক্ষাবলয় ভেদ করে, গোপনে চীনের অন্যতম চতুর্থস্তরের জীবনিরাপত্তাযুক্ত হুবাইয়ের উহান গবেষণাগারে পাঠান। চীনা কমিউনিস্ট মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস এটি মিথ্যা গুজব বলে উড়িয়ে দেয়। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মতে, করোনা ভাইরাসের জিন-মিউটেশন ঘটিয়ে ও এইডসের বীজাণু এইচআইভি-র সংযোজন করে চীনা বিজ্ঞানীরা এর মারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে মানুষের উপর পরীক্ষা চালাচ্ছে। অনুমানের ভিত্তিতে লেখা এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হলেও আজকের অন্তর্জাল জগতে নেটিজেনদের দৃষ্টির অন্তরালে যায়নি। 'জিরো হেজ' নামক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে সংবাদটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

ইউএ.ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট গুলফ্‌রাজ খান 'ভাইরলজি' পত্রিকায় এ কথার পুষ্টি করেছেন। তাঁর মতে, ২০১২-তে সৌদিতে থাকাকালীন করোনা ভাইরাসটির মানুষের মধ্যে সংক্রমণ বা মারণক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মধ্যবর্তী সাত বছরে জিনগত মিউটেশন ঘটিয়ে কৃত্রিমভাবে সংক্রমণ এবং প্রাণঘাতী ক্ষমতা ভয়ংকরভাবে বাড়ানো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কী উদ্দেশ্যে, কার নির্দেশে, এই কাজটি করেছে, জীবাণু-গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানে অপরাধীদের খোঁজ পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতেই ২০০২-তে দক্ষিণ চীনের গুয়াংডং প্রদেশে প্রথম করোনা, এসএআরএস ওরফে সার্স-কোভ-১-এর উৎপত্তি হয় যা ২৯টি দেশের ৮০০০ রোগীকে সংক্রমিত করে ৭৭৮ জনকে মেরে ফেলে। পরে ২০১২-তে সৌদিতে দেখা দেয় ভিন্ন করোনার ভয়ংকর মহামারী যা এমইআরএস ওরফে মার্স-কোভ মরুভূমির জাহাজের মাধ্যমে উপসাগরীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে ৮৫৮ জনের মৃত্যু ঘটায়। সম্প্রতি ২০১৯-তে চীন আবিষ্কৃত অভিনব সংক্রমণ এবং মারণক্ষমতাযুক্ত করোনা ভাইরাসটিকে সার্স-এন- কোভ-২ বা কোভ-১৯ বলা হচ্ছে। লন্ডনের সেন্ট থমাস হসপিটালের ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপিস্ট, স্কুল-পালানো স্কটিশ মেয়ে জুন আলমিডা ১৯৬০-তে অবিকল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মতোই দেখতে কিন্তু নতুন অন্য একটি ভাইরাসের সন্ধান পান। কোষ সংলগ্ন আঁকশিগুলি সূর্যকিরণের মতো ছড়িয়ে থাকায়, নাম রাখেন করোনা।

সংবাদে প্রকাশিত, চীন উদ্ভূত করোনা মহামারীতে সারাবিশ্বে সংক্রমিত ৩০ মিলিয়নের মধ্যে ৯.৫৬ লক্ষের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে গোপনে চীন, রাশিয়া, নর্থ কোরিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা-সহ পৃথিবীর ১৭টি দেশে জৈবাস্ত্রের গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গেই জীবাণু আর তার থেকে উৎপাদিত বিষাণুবিদ্যারও প্রসার ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের সৃষ্ট কৃত্রিম জীবাণু বা বিষাণু মানব মস্তিষ্ককেও বিভ্রান্ত করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাজনেতারা বিজ্ঞানীদের কাজে লাগান নানারকম মারণাস্ত্র নির্মাণে। জাপানি ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা অ্যানথ্রাক্স, প্লেগ, গুটিবসন্ত, কলেরা ও টুলেরিমিয়ার বোমা তৈরি করেছিল। আর্নেস্ট রুসকা ১৯৩১-তে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করে ৪০০ গুণে বর্ধিত ভাইরাসগুলিকেই মানবনিধনের অস্ত্র করা হলো। রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাকের বিষ দিয়ে কৃত্রিমভাবে লক্ষাধিক মানুষের বিনাশ করা হলো। প্রেসিডেন্ট রেগন, জ্যেষ্ঠ বুশ এবং ক্লিনটনও জৈবযুদ্ধে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। গোপনে জৈব অস্ত্রের গবেষণা বা মজুদ ভাণ্ডারের কথা চীন, পাকিস্তান, বা উত্তর কোরিয়া অস্বীকার করছে বটে তবে বিটিজেডবল্যুসি-র সদস্যদেশ হয়েও প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন অকপটে স্বীকার করেছিলেন রুশবিজ্ঞানীদের জৈব-গবেষণার কথা। গোপনে তাইওয়ান, হংকং ও পাকিস্তানের পরীক্ষাগারে গবেষণা চালিয়ে আমেরিকার চ্যালেঞ্জার চালাক চীন ১৯৮০-তে শুরু করলেও জৈবযুদ্ধের মহড়ায় এখন সবার আগে। চীনের প্রাক্তন রক্ষামন্ত্রী জেনেরাল চি.হাওসিয়ান ('৯৩-'০৩) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন :

● জনসংখ্যা, বাসস্থান ও দৈনন্দিন রুটিরোজগার বাড়িয়ে আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপকে দখল করো। দেশীয় কমিউনিস্টরা আমেরিকাকে দোষ দিলেও বিস্তারবাদী চীনের সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে।

● চীনের বাইরে বসতি স্থাপন করো। কলকাতার চীনাবাজার, কাঠমাণ্ডু কিংবা সানফ্রানসিসকোর চায়নাটাউন তার প্রতিফলন। স্থানীয় মহিলাদের প্রেমজালে ফাঁসিয়ে, নাগরিকতা অর্জন করে, উপনিবেশ বানাও। কমিউনিস্ট চীনাদের অত্যাচারে পাশ্চাত্যদেশেও স্থানীয়রা ভারতের মতোই নিজ দেশে পরবাসী হয়েছেন। লিবিয়ার স্বৈরশাসক গদ্দাফি একবার বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ৫০ মিলিয়ন মুসলমানের জনবিস্ফোরণই ইউরোপকে মুসলমান মহাদেশে পরিণত করবে।

● ভিন দেশে চীনা উপনিবেশের প্রতিবন্ধক আমেরিকাই হচ্ছে আধুনিক চীনের অগ্রসরের প্রধান অন্তরায় ও শত্রু।

● জনবিরল অথচ বিশাল স্থলভূমিযুক্ত আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আফ্রিকাতেই উপনিবেশ গড়তে হবে।

● পারমাণবিক বোমার চেয়েও শক্তিশালী জৈবাস্ত্রই হবে ভবিষ্যতের অমোঘ মারণাস্ত্র। চীন জীবাণু ও বিষাণুর মারণযজ্ঞের দ্বারাই সারাবিশ্বকে জয় করবে একদিন।

চীনসৃষ্ট করোনা মহামারী ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক ট্রেলার। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনে গোপনে চলছে জৈবযুদ্ধের পরীক্ষানিরীক্ষা এবং উৎপাদনের অদৃশ্য প্রতিযোগিতা। সারাবিশ্বের উৎসাদন-যজ্ঞে মগ্ন ওই দেশগুলিই হবে মারণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত। পাকিস্তানের মাধ্যমে ভারতকে এবং উত্তর কোরিয়ার দ্বারা আমেরিকাকে চীন দমিয়ে রাখছে। ইসলামের অবিকল প্রতিরূপ বিস্তারবাদী চীনের একানায়কতন্ত্রবাদ তার টোটালিটেরিয়ান মতবাদেরই ফসল। একজন নিরীশ্বরবাদী, অন্যজন অতি-ঈশ্বরবাদী। দুটি 'ইজমই' পৃথিবীর বিনাশের কারণ হবে।

জৈবযুদ্ধে অজান্তে প্রযুক্ত অস্বাভাবিক জীবাণু বা বিষাণুর অভূতপূর্ব সংক্রমণে গণহত্যা সংঘটিত হয়। রোগনির্ণয়, প্রতিরোধ, প্রতিকার, ভ্যাকসিন বা ওষুধ থাকে অপ্রাপ্য। ব্যাকটেরিয়া (অ্যানথ্রাক্স, টুলেরিমিয়া বা র‍্যাবিট ফিভার, প্লেগ, গ্ল্যান্ডার, টাইফাস, ব্রুসেলা, কিউ ফিভার), ভাইরাস (হান্টা, ইবোলা, মারবার্গ, এনকেফালাইটিস, আফ্রিকান বা সাউথ আমেরিকান হেমোরেজিক ফিভার, গুটিবসন্ত), ছত্রাক (চালগমের বিষ) ও জৈববিষাণু (রেড়ির বীজ, রিসিন, বটুলিনম, সিগা-টক্সিন, এপসিলন, এন্টেরোটক্সিন-বি) মারণাস্ত্র হিসেবে উৎপাদিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আকাশ থেকে ছড়ানো কেজিখানেক বিশুদ্ধ বটুলিনাম একটি দেশের সমস্ত মানুষকে কয়েক ঘণ্টায় শেষ করে দিতে পারে। জাপান ও জার্মানি বিশ্বযুদ্ধের সময় গিনিপিগের মতো যুদ্ধবন্দিদের উপর ওইসব জৈবমারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাত। আমেরিকা ১৯৪৪-এ মাসিক ৫০ হাজার পাউন্ড অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটেরিয়া উৎপাদনের জন্য বিশালাকায় কারখানা বানায়। ষাটের দশকের শেষে আমেরিকা ফোর্ট-ডেট্রিকে আকাশ থেকে প্লেনের সাহায্যে জীবাণু ছড়িয়ে পরীক্ষা করলে সংবাদমাধ্যমে

তীব্র বিরোধিতা প্রদর্শিত হয়।

১৯৫০ সালে রাশিয়ার কমিউনিস্টরা 'বায়োপ্রিপারট' প্রকল্পের মাধ্যমে সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করেছিল ভয়ংকর জৈবজীবাণু আবিষ্কারের জন্য। ১৯৬০ সালে আমেরিকায় ১০০০ কেজি 'রাইস-বাস্ট' ও ৩৬,০০০ কেজি 'হুইট স্টেম-রাস্ট' পাখির পালকে মাখিয়ে আকাশ থেকে উর্বর জমিতে ফেলে ৫০ শতাংশ ফসল ধ্বংস করার পরীক্ষা চালিয়েছিল। ব্রিটেনের মিলিটারি জার্মানির শহরে পশুখাদ্যের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স মিশিয়ে পশুসম্পত্তির বিনাশসাধন করেছিল।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, আমেরিকার কংগ্রেস সেনেটরদের সুন্দর খামে জিএম অ্যানথ্রাক্স পাঠানো হয় যাতে ৫ জন মারা যান, ২২ জন ভীষণভাবে অসুস্থ হন এবং লক্ষাধিক ডলার সংক্রমণ পরিষ্করণের কাজে খরচ হয়। চীনের নৃশংস সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ঝাং শিবোর কথায়, সরকারের উচিত পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী জৈবাস্ত্রের অনুসন্ধান করা। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য আধুনিক জৈবাস্ত্রের আক্রমণাত্মক সক্ষমতাকে আরও বাড়াতে হবে। জেনেটিক-অস্ত্র প্রয়োগ করে জাতির সমাপ্তি, যেমন হান চীনাদের দ্বারা প্রজননক্ষম তিব্বতীয় বৌদ্ধ কিংবা উইঘুর মুসলমান মহিলাদের উপর প্রয়োগ করে,জাতি ও বংশগত পরিবর্তনে নতুন চীনাদের সৃষ্টি হবে। পিএল-এর বিজ্ঞানীরা এখন সামরিক বাহিনীতে সুপারকম্পিউটার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মস্তিষ্কবিজ্ঞান প্রয়োগে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে। আমেরিকার দাবি, টাফট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চীনা ছাত্ররা গোপনে সংবেদনশীল মিলিটারি তথ্য চীনে রপ্তানি করেছে। একথা চীনা সেনাধ্যক্ষ নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'আমেরিকার পঞ্চম জেনেরেশনের ফাইটার র‍্যাপ্টর-জেট-এফ-৩৫- এর অনুকরণে চীনের চেংদু-এফ-২২ নির্মিত হয়েছে'। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর বিদেশে অধ্যয়নরত পাকিস্তানি ছাত্রের পরমাণুবোমায় হিন্দুদের শেষ করে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সেজন্যই ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানি বিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খান জেনারেল জিয়াকে নেদারল্যান্ডের ল্যাবরেটরি, ইউরেনকো থেকে ইউরেনিয়ামের আণবিক বোমা নির্মাণ-পদ্ধতি চুরি করে পাঠায়। কেনচুকিতে ১৯৫৪ সালে জর্জ দেভল প্রথম রোবটের জন্ম দেন। এখন ২০২০-তে মাইকেল লেভিনের মতো চীনা বিজ্ঞানীরাও ব্যাঙের ভ্রূণ থেকে স্টেম-সেল নিয়ে ত্বক এবং হৃদযন্ত্রের কোষে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে সজীব, স্বয়ংক্রিয় ও কর্মক্ষম ১ মিমি-র জীবন্ত- রোবট বা 'জেনোবট' তৈরি করেছেন। আধুনিক কম্পিউটার ও কৃত্রিম জীবনের সমন্বয়ে নির্মিত জেনোবট চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি যুগান্তকারী অভিনব আবিষ্কার।

হার্ভার্ডের প্রোফেসর চার্লস লাইবারকে ২৮ জানুয়ারি, ২০২০-তে এফবিআই-এর গোয়েন্দারা বিদেশে তথ্যপাচারের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। কাকতালীয় ভাবে কানাডার ন্যাশনাল মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরির প্রধান প্রফেসর ফ্রাঙ্ক প্লুমার, যিনি সৌদির করোনা ভাইরাস নিয়ে কাজ করছিলেন, আকস্মিকভাবে কেনিয়াতে ঠিক ৬ দিনের মাথায় ফ্রেব্রুয়ারির ৪ তারিখে মারা যান। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলের সন্দেহ, বিদেশে তথ্যপাচারের সঙ্গে এই মৃত্যুটিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। জিন-গবেষণার তথ্য যদি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাতে পড়ে তাহলে সারাবিশ্বের জন্যই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে।

আজ জৈবপ্রযুক্তি বিজ্ঞানে চীন পশ্চিমের দেশগুলিকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। ২০১৬ সালে চীনের সমরিক বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সংস্থা এএমএমএস-এর এক গবেষকের থিসিসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল চীন কৃত্রিম উপায়ে ক্রিস্প-আর/কাস-৯ জিনযন্ত্রের সাহায্যে মানুষের সহজাত কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির প্রযুক্তিতে সফলতা লাভ করেছে। এর সাহায্যে চীনা সেনাদের ভবিষ্যতে যুদ্ধের সক্ষমতা ও কৃত্রিম উপায়ে অতি-মানবের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি লিখেছেন, মোডফিনিল নামক ওষুধ দিয়ে মস্তিষ্কের চেতনার স্তরকে প্রভাবিত করে অস্বাভাবিক কাজও করানো যাবে দ্রুত গতিতে।

হলিউডের সিনেমাগুলিতে বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনিগুলির বাস্তব রূপায়ণে মানুষ একদিন হয়তো দৈত্যে পরিণত হবে। সাইবারডাইন সিস্টেম ও স্কাইনেটে অভিজ্ঞ টার্মিনেটর ওরফে আর্নল্ড শোয়েজেনজার ও সুপার-সোলজার 'হাল্ক' ওরফে ব্রুস ব্যানারের কথা আমাদের পুঁথিপুরাণে উল্লেখিত ভস্মাসুর ও মহিষাসুরদির কথা মনে করিয়ে দেয়।

২০১৮ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ চীনের শেনঝেনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী হে জিয়ানকুই বলেন, ক্রিস্প-আর/কাস-৯ জিন-যন্ত্রের সাহায্যে তিনি জিন-পরিবর্তিত এক কৃত্রিম শিশুর জন্ম দিয়েছেন। কৃত্রিম উপায়ে পূর্ণবয়স্ক সাধারণ দেহকোষ থেকে ১৯৯৬-তে ইংল্যান্ডে ডলি নামক মেষশাবকের জন্ম হলে সারাবিশ্বে হইচই পড়ে যায়। রবার্ট লুই স্টিভেনসন, ১৮৮৬ সালে ডাঃ জেকিল এন্ড মি হাউড উপন্যাস সৃষ্টি করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চীনা বিজ্ঞানীরা ১৯৩১ সালের সিনেমা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো মানবদৈত্যের সৃষ্টি করবে না তো? সামান্য টাকার বিনিময়ে চীন বা পাকিস্তানি বিজ্ঞানীরা এই ক্রিস্প-আর/কাস-৯ জিন-যন্ত্রের সাহায্যে অভূতপূর্ব কৃত্রিম ও প্রাণঘাতী জীবাণু ও বিষাণু সৃষ্টি করে শুধু শত্রুদেশ ভারতেরই নয়, সারাবিশ্বকেই ধ্বংস করে দিতে পারবে। সস্তায় সামান্য গবেষণাগারেই হয়তো ভবিষ্যতে জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে মাওবাদী ও তার জমজ ভাই জেহাদিরা গুটিবসন্ত বা ইবোলার মতো ভয়ানক কৃত্রিম জৈবজীবাণুর সাহায্যে সনাতনীদের শেষ করে দেবে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে স্কুলে 'বিজ্ঞান অভিশাপ না বরদান' বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতাম। আজ তারই ভয়ংকর পরিণতি বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ভ্রষ্ট বিজ্ঞনীরা ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় গোটা বিশ্বসংসারকেই বিনাশের পথে নিয়ে যাবে মিথ্যা মতাদর্শের প্রেরণায়। অবশ্য সাইবার, সুপারকম্প্যুটার, জেনেটিক্স রোবট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিজ্ঞানচর্চায় সবদেশের মতো ভারতও পিছিয়ে নেই। দেশভক্ত মোদীজীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারতে বিজ্ঞানীরাও আজ চীনকে পরাস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ▮

মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত একদল মহাপ্রাণ

অজয় সরকার

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানুষ তার জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে প্রকৃতির রোষ। এই রোষ যেন চিরন্তন। সাময়িক বিরতি এলেও প্রকৃতির ক্রোধোন্মত্ততা যেন সময়ের চিরপ্রবহমানতায় সুপ্ত। এই সুপ্ত রোষ কখন যে তার ভয়াল রূপ নিয়ে মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে, তা মানুষ জানে না। বিজয় ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু তা যেন শুভ শক্তির উপর নতুন করে আছড়ে পড়ার আগে অশুভ শক্তির সাময়িক বিশ্রাম। অশুভ শক্তিরূপী করোনা চীনের ল্যাবরেটরিতে জন্ম নিয়েছে না এটা প্রকৃতিজাত, তা নিয়ে বিতর্ক আছে এবং থাকবে। যা অবিতর্কিত তা হলো, প্রথমত, করোনার করাল থেকে এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ হয় আতঙ্কিত না হয় আক্রান্ত

যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় কিছুটা পূর্বানুমান করা যায়, তবে তাতে আত্মরক্ষার সুযোগ থাকে না। প্রকৃতির এই রোষ কখনো ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, সুনামি, মহামারী বা অন্যান্য প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে মানব জীবনকে তছনছ করে দিতে চেয়েছে। আবার কখনো মনুষ্যসৃষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ মানবজাতির জীবনে এক ঘোর অমানিশা ডেকে এনেছে। রক্ত ঝরেছে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা পেয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে, চোখের সামনে তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্পদকে ধ্বংস হতে দেখেছে কিন্তু মানুষ আত্মসমর্পণ করেনি। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সারা পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ বা জনগোষ্ঠী নেই যারা করোনার এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম গড়ে উঠেছে, তাতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম, তার প্রধান উপাদান হলো 'সেবা'। তাই সেবামূলক কাজ করা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াজাত নয়।

'সেবা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো শুশ্রূষা বা পরিচর্যা। যেমন আরবি ভাষায় এর অর্থ হলো 'আলখিদামত'। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে যুদ্ধে আহত একজন মুজাহিদকে (সৈন্যকে) খিদামত (শুশ্রূষা) করতে নিজেকে নিয়োজিত করাই হলো আলখিদামত। আর্ত, পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ব্যক্তি, প্রচেষ্টা দেখা গেলেও সেবাকাজ কখনোই তাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেনি। আবার ১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অসংখ্য আহত সৈনিকের শুশ্রূষা ও পরিচর্যার জন্য ইংরেজ তরুণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। তাঁর অতুলনীয় সেবাকাজে মুগ্ধ হয়ে সৈনিকরা তাঁকে 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত, ইউরোপ মহাদেশে তখন থেকেই 'সেবা' শব্দটি একটা আনুষ্ঠানিকতা অর্জন করে। তার আগে ইউরোপীয় সমাজে 'সেবা' শব্দের ব্যবহার ব্যক্তি বা পরিবারের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে বা ধর্মীয় জীবনে 'সেবা কাজ' থাকলেও তার ভূমিকা ছিল অতি গৌণ। যেমন, আজ যেসব খ্রিস্টান মিশনারি এদেশে সেবাকার্য চালান, তার মধ্যে বিশ্বমানবতা বা 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' জাতীয় উদার বিশ্বজনীন ভাবনার স্থান নেই। বরং বাস্তবতা হলো, তাদের সেবা কাজের অন্তরালে থাকে ধর্মান্তরকরণ বা বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির মতো হিসেব নিকেশ। এমনকী, মাদার টেরিসার মতো মহীয়সী এই অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। তাই একটা সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি যে, ইউরোপ এবং মুসলমান জগতে 'সেবা'

শব্দটি প্রতিক্রিয়াজাত। অর্থাৎ যুদ্ধ বা ধর্মান্তরকরণ হলো ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জন্ম হলো 'সেবা' শব্দটির। আমাদের মধ্যে আর্ত-পীড়িতদের শুশ্রূষা করার যে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে, তার অন্তর্নিহিত উপাদান হলো প্রেম বা ভালোবাসা। এই প্রেম বা ভালোবাসা কোনো ধর্মীয়, ভৌগোলিক বা সময়ের গণ্ডীতে সীমায়ত নয়। এই প্রেম বা ভালোবাসা বিশ্বজনীন ও শর্তহীন তখনই হতে পারে যখন কোনো এক দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপার দেশপ্রেম সেই জনগোষ্ঠীর জীবনপদ্ধতির চিরায়ত সংস্কারের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এই উপলব্ধির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণীতে – 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' স্বামীজীর উপলব্ধির প্রতিফলন দেখি আলিপুরদুয়ার জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং সেবিকাদের সেবা কাজে। অনেক সময় সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় সংখ্যায় বিকৃতি ঘটানোর জন্য। তাই, আমি সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেব না। একটি ছোটো উদাহরণ :

সাতটি জনবিরল দুর্গম ছোটো গ্রাম যেখানে সাধারণের পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব নয়। এই এলাকাগুলি হলো : সদর বাজার (২৮৪৪ ফুট), লেপচাখা (৩৫০০ ফুট), খাটালাইন (২৮৪৪ ফুট), দাঁড়াগাঁও (১২০০ ফুট), ওচলুং, তাসিগাঁও (৪৫০০ ফুট), লালবাংলা (২৮৪৪)। এই গ্রামগুলো বক্সা পাহাড়ের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব কোণে ভুটান-অসম সীমান্ত লাগোয়া আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত। এই পাহাড়ের অধিবাসীদের বেশিরভাগ ডুকপা (ড্রুগপা নামে পরিচিত), লেপচা ও ভুটিয়া সম্প্রদায়ের। প্রকৃত অর্থে এরা প্রকৃতির সন্তান, তবে তারা নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে দাবি করেন। মনে হয় যে এটা ভগবানের দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত যে তারা একদিকে যেমন আধুনিক জীবনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তেমনি অপরদিকে প্রকৃতির অপার স্নেহে আশীর্বাদধন্য। সন্দেহ নেই কোভিড-১৯-এর পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রভাব এই ছোটো গ্রামগুলিতে বসবাসকারী ১৬৫টি পরিবারের দৈনন্দিন জীবনয়াত্রায় সরকার ঘোষিত 'লকডাউন' মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু করোনার ভয়ংকরতা এই পার্বত্য অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনের স্পন্দন থামাতে পারেনি।

আলিপুরদুয়ার জেলার স্বয়ংসেবকরা এই ছোটো ছোটো গ্রামগুলির মানুষদের মধ্যে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামবাসীদের অনেকেই ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করতে বেশিদূর আসতে পারবেন না, তাই স্বয়ংসেবকরা রুক্ষ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে 'জিরো পয়েন্ট' (গাড়ি যাবার শেষ বিন্দু)-এ ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যান। ১৬৫টি পরিবারের হাতে চাল, ডাল, ওষুধ সমেত জীবন ধারনের ন্যূনতম উপাদান সমূহ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, পার্শ্ববর্তী সান্তালাবাড়ি ও পাম্পুবস্তির কিছু অধিবাসীদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে স্বয়ংসেবকরা তাদের জীবনসংগ্রামের অংশীদার হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, যাদের মধ্যে ত্রাণ বিলিবণ্টন করা হলো তাদের একজনও উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে 'তথাকথিত হিন্দু' নন।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ও কুমারগ্রাম এলাকা বনবাসী অধ্যুষিত। এছাড়া, এখানকার অধিবাসীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হলেন রাভা ও বোরো উপজাতির মানুষ। বনবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি। এই সমস্ত এলাকায় খুব কম পরিবার আছে যেখানে স্বয়ংসেবকরা ত্রাণ সামগ্রী ও হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে যাননি। শুধু কী তাই? আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারীহাট ব্লকের একটা গ্রামপঞ্চায়েতের নাম খয়েরবাড়ি। সেই খয়েরবাড়ি অঞ্চলের একটি স্থানের নাম ইসলামাবাদ। না, ভুল করবেন

না— আসলে সরকারি নথিতে ইসলামাবাদ বলে কিছু নেই। এই গ্রামের প্রায় অধিকাংশ লোকজন মুসলমান। হয়তো, তাদের প্রভাবের জন্যই তারা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে দমন করতে পারেনি। এটা বড়ো দুর্ভাগ্য! স্বয়ংসেবকরা বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। ত্রাণ, ওষুধ সেখানে পৌঁছে দিতে হবে, এটাই তো সে তার দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করে। এটাই হিন্দুত্ব, এ শিক্ষা হঠাৎ করে অর্জিত হয়নি, এ শিক্ষা সে তার পারিবারিক, সামাজিক জীবন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন এবং বিশ্বজনীন মানব প্রেমে উন্নীত করার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে। এটা একদিনে হয় না। শিশুকাল থেকে প্রাত্যহিক জীবনে এই সংস্কার সে আয়ত্ত করেছে। এটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াজাত সেবাকার্যের শর্তের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

স্বয়ংসেবকদের রাষ্ট্রভক্তি এবং বিশ্বজনীন মানব প্রেমের উৎস কী? বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতকে বলতে শুনি যে দেশাত্মবোধ হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। সাহেবদের এঁটো পাতায় প্রসাদ ভক্ষণকারী দেশীয় কিছু পণ্ডিত এই ভাবনায় সঙ্গে মাথা দোলান। এই পণ্ডিতপ্রবরের দল জানেন না যে হিন্দুরা কোনোদিন দেশকে প্রকৃতিগত সীমানায় আবদ্ধ করে রাখেনি। হিন্দুর কাছে দেশ জড়পদার্থ নয়, দেশ তাঁর জাতীয় আত্মার প্রকাশ। হিন্দুর স্বদেশপ্রেম তাই ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস নয়, তাঁর সনাতন ধর্মের অঙ্গস্বরূপ মাতৃসাধনা। ঠিক এই কারণেই হিন্দুর রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে সেবামূলক কাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ : ১৫৮৬ সালে জুটফেনের যুদ্ধে স্যার ফিলিপ সিডনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। মৃত্যুপথযাত্রী ফিলিপ সিডনির কাছে সমভাবেই আহত আর একজন সৈনিক জল দিতে গেলে সিডনি বলেছিলেন, 'The necessity is yet greater than mine.' ছোটোবেলায় বার বার লাইনটি পড়েছি। মনে হয়েছে, মরণোন্মুখ সিডনি যেন জীবনের অন্তিমলগ্নে এই উদারতার মধ্য দিয়ে নিজেকে অবিনশ্বরতা দিতে চেয়েছিলেন। এ যেন ঘোর নশ্বরতার মাঝে অবিনশ্বরতার অন্বেষণ। কারণ হলো, তার এই মহতি উক্তি তাকে ব্যক্তি গণ্ডীতে আটকে রেখেছে, তিনি নিজেকে বিশ্বমানবতায় উন্নীত করতে পারেননি। অন্যদিকে, যখন দেখি, অসুরের অত্যাচারে বিশ্বচরাচর ভীত; সন্ত্রস্ত মানবজাতির পরিত্রাণের কেউ নেই, তখন দধিচি এগিয়ে এসে বিশ্বমানবের কল্যাণে হাসি মুখে নিজের জীবন আহুতি দিলেন, তখন পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় জীবন দর্শনের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দধিচি বিশেষ্য পদ রইলেন না, তার আত্মত্যাগ তাকে বিশেষণ বানিয়ে দিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যখন করোনার ভয়াল ভ্রূকুটিকে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে পাহাড়ি দুর্গম পথে সেবাকাজে এগিয়ে গেছেন, তখন এরা আর বিশেষ্য পদ থাকেননি। তাই আমি কার নাম উল্লেখ করবো? এদের মাঝে যে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, মুচি, মেথর খুঁজে পাইনি। এদের মধ্যে শুধু দেখেছি বিশ্বমানবতায় উন্নীত আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত একদল মহাপ্রাণই। □

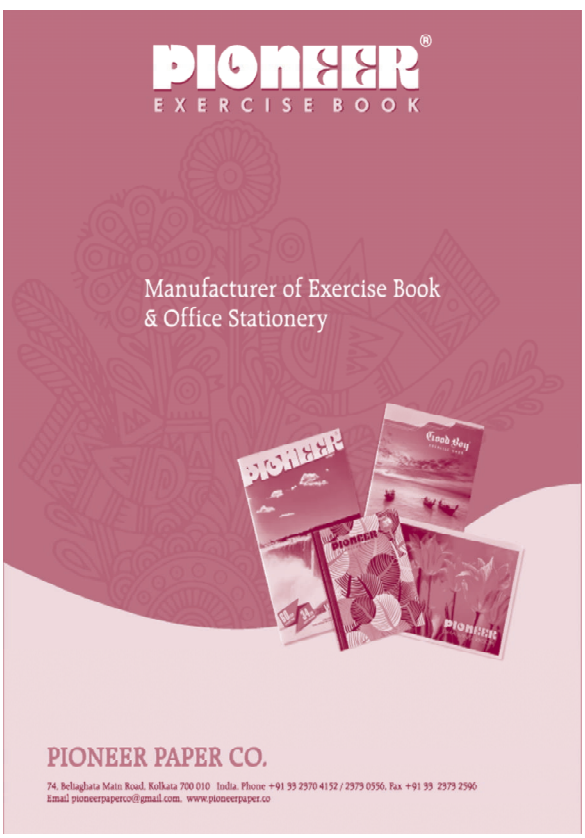

রাজনীতির জাতাকলে পিষ্ট প্রকৃত দলিতরা

বিদ্বেষহীন, বৈষম্যহীন, রাষ্ট্রীয়, সনাতনী হিন্দুত্ব যত সক্রিয় হয়ে উঠছে, হিন্দুত্বের নামে সনাতনী চেতনা যত জাগ্রত হওয়ার চেষ্টা করছে, হিন্দু-হিন্দু ভাই-ভাইয়ের আদর্শে সমগ্র হিন্দুসমাজ যখন এক হচ্ছে তখন রাজনীতির 'ঠিকাদার'রা বর্ণবৈষম্য, উঁচু-নীচুর তাস খেলছে।

সুজন পাণ্ডা

যে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, পদদলিত তাকেই দলিত বলা হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই 'দলিত' শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ হতে শুরু করে। প্রাচীন ভারতে বর্ণব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বাইরে পঞ্চম কোনো বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না। বর্ণব্যবস্থায় শূদ্ররা কোনোভাবেই কারোর থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলেন নিষাদরাজ গুহক, কৈবর্ত্য রাজ, বানররাজ সুগ্রীব। মাতা শবরীর মতো তপস্বিনী শ্রীরামচন্দ্র যাঁকে নিজের মায়ের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। ধর্মধুরন্ধর মহারাজ হরিশচন্দ্র সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ডোমরাজা কালু ডোমের কাছে, সেই সময় হরিশচন্দ্রকে কিনে নেবার ক্ষমতা বা সাহস কারোর ছিল না। মহাভারতকালে মহাত্মা বিদুর, মহাত্মা সঞ্জয়, মহাত্মা ধর্মব্যাধের সম্মান কারোর থেকে কম ছিল না। সহজেই অনুমান করা যায় প্রাচীনকাল থেকেই শূদ্রদের, দলিতদের ওপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারের যে অপপ্রচার চলছে তার সত্যতা কতখানি। বৈষম্য অবশ্যই ছিল। সেই বৈষম্য কোনো একটি বর্ণের প্রতি নয়। সেই বৈষম্য, অত্যাচার ছিল ধনীদের গরিবদের প্রতি, শক্তিমানের দুর্বলের প্রতি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ক্ষত্রিয়, দরিদ্র বৈশ্য, দরিদ্র শূদ্র তখনও ছিল এখনো আছে। তখন তারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাত পেতে ঘুরে বেড়াতেন সাহায্যের জন্য। প্রবঞ্চনার শিকারও হতেন। এখন তারা রাজনীতির শিকার। তাদের নিয়ে রাজনীতি হয়।

বর্তমানে প্রকৃত 'দলিত' হলেন তারা, যাদেরকে সমাজ অচ্ছুত করে রেখেছে। সেটা হয়েছে তাদের কাজের জন্য। বর্তমানে 'দলিত' আন্দোলনের নামে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার যে ষড়যন্ত্র চলছে তার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন জরুরি। প্রকৃত 'দলিত'দের অবস্থার উন্নতির চেয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরিই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যারা প্রকৃত 'দলিত' নয় কিন্তু দলিতের তকমা লাগিয়ে রুটি সেঁকতে শুরু করেছে। এই ধরনের স্বার্থান্বেষীদের মুখোশ খোলা জরুরি।

প্রাচীন ভারতের 'অচ্ছুত' কারা? মুসলমান শাসনের পূর্ববর্তী ভারতে 'অচ্ছুত' ছিল ১ শতাংশ। অচ্ছুত আর বর্তমানের দলিত এক জিনিস নয়। তারাই হতো কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির সে যে বর্ণেরই হোক না কেন ধর্মীয়, সামাজিক ব্যাভিচার প্রমাণিত হলে, সে যে সমাজে থাকত সেই সমাজ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হতো। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের শাস্তি বেশি ছিল। কোনো ব্রাহ্মণ যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হতেন, অখাদ্য খেতেন, গো-হত্যা করতেন, স্বগোত্রের বা তুতো সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করতেন সেক্ষেত্রে তাকে সেই সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হতো। তার জন্য সমস্ত সামাজিক সুযোগ সুবিধা বন্ধ করা হতো। অপরাধী ব্যক্তির সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখতেন তাদেরও একই শাস্তির বিধান ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যান্য বর্ণের একই অপরাধে কম শাস্তি ভোগ করতে হতো। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করার পর তাঁরা নিজের সমাজে ফিরে আসতেন। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বাড়ির গোরু মারা যাবার শাস্তি ছিল তারা মৃত গোরুর দড়ি গলায় পরে, কাছা পরে, বাড়ি বাড়ি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে একমাস প্রায়শ্চিত্ত করা। সেই একমাস তারা কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না, নিজের বাড়িতে থাকতে পারতেন না। একমাস পরে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতেন। বেশ কিছু বছর আগেও হিন্দু গো-হত্যাকারীদের দেখা যেত, গলায় পাঘা অর্থাৎ মৃত গোরুর দড়ি বেঁধে, ভিক্ষে করতে। বর্তমানে গো-হত্যাকে সার্বজনীন করা হচ্ছে। গোরুর গায়ে কালি দিয়ে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে। যার গোরু তার নামের প্রথম অক্ষর কালি দিয়ে গোরুর গায়ে এঁকে দেওয়া হচ্ছে। যাকে বিধর্মীরা বিশেষ দিনে হত্যা করবে। যে গো-হত্যার জন্য আমাদের ধর্মে এতবড়ো শাস্তির বিধান ছিল। সেই সমাজ, সেই

সমাজের গণতান্ত্রিক শাসককুল গোহত্যা বন্ধের ব্যাপারে আজ উদাসীন। মদ, পরস্ত্রী, চুরি এসব ব্যাভিচারের জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান ছিল। প্রাচীনকালে স্বেচ্ছাকৃত অপরাধে, চরিত্র দোষে, কাম-ক্রোধ-লোভের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণে কৃত অপরাধের শাস্তি হিসেবে অচ্ছুত জীবনযাপন করতে হতো।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বাইরে পঞ্চম কোনো বর্ণের প্রমাণ নেই। তাহলে 'দলিত' কারা? কীভাবে 'দলিত' শ্রেণী তৈরি হলো? ভারতে মুসলমান শাসনের শুরুর সঙ্গে সঙ্গে 'দলিত' শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। এই দলিতরা আর কেউ নয়, যেসব হিন্দু ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর যুদ্ধবন্দি হতো তাদের সামনে দুটি রাস্তা ছিল, হয় ইসলাম গ্রহণ করা না হলে মুসলমান শাসকদের ক্রীতদাস হয়ে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ করা। যারা তরোয়ালের ভয়ে সেই সময় স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারাই বা তাদের বংশধররাই আজ বর্তমান ভারতের মুসলমান। যেসব ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ না করে মুসলমান শাসকদের মল, মূত্র, নোংরা পরিষ্কার করার কাজকে স্বীকার করেছিল তারাই আজকের মহত্তর, মেহেতার বা মেথর। ঘৃণিত কাজ করার জন্য তারা নিজেদেরকে অশুদ্ধ মনে করে আশ্রমোচিত ধর্ম ত্যাগ করে উপবীত বা পৈতে ত্যাগ করেছিল তাই তাদের ভাঙ্গিও বলা হয়। সেই মহান ত্যাগীরা কোনো অবস্থাতেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম স্বীকার করেনি। এরা নমস্য।

প্রাচীন ভারতে বাস্তুভিটের মধ্যে শৌচকর্ম করার কোনো নিয়ম ছিল না। বসতি এলাকা থেকে দূরে কোনো নির্দিষ্ট গোপনীয় স্থানে নারী এবং পুরুষদের জন্য আলাদা জায়গায় প্রাতঃকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হতো। নদী পুকুরে স্নান করে সেই শৌচ দশা থেকে মুক্ত হয়ে তবেই বাস্তুভিটের মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল। হিন্দুধর্মে ঘরই ছিল মন্দির, সেখানে কুলদেবতার পূজা ও কর্মকাণ্ডিক অনুষ্ঠান হতো। বাস্তুভিটে ছিল মন্দিরের মতোই পবিত্র। তখন মলমূত্র পরিষ্কারের জন্য বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হতো না। এখনো গ্রামেগঞ্জে অনেকে টয়লেট বা বাথরুম বসতবাড়ির থেকে কিছুটা দূরে নির্মাণ করেন। এটাই প্রমাণিত হয় প্রাচীন ভারতে 'দলিত' ভাঙ্গি-মেহেতার-মহত্তর বলে কোনো জাতি ছিল না। মুসলমান শাসকরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে বন্দি যোদ্ধাদের দিয়ে এই কাজ করাতেন। ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হিন্দুদের এই নোংরা কাজ করালে অন্যান্য হিন্দুরাও মানসিক ভাবে ভেঙে পড়বে এবং সহজেই ইসলাম স্বীকার করবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। সেই সময়ের বীর যোদ্ধারাই আজকের মেহেতার বা ভাঙ্গি। এরাই প্রকৃত দলিত। সেই ঘৃণিত কাজ তারা আজও করে চলেছেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তাদের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয়নি। কেননা তাদেরকে সবার দরকার। মুসলমান শাসকদের তৈরি করা দলিত ভাঙ্গিরা খ্রিস্টান ও ইংরেজদেরও মলমূত্র নর্দমা পরিষ্কার করে এসেছে। বর্তমানে 'ঘরে পায়খানা করা' হিন্দুদেরও তাদের প্রয়োজন। যারা 'দলিত দলিত' বলে গলা ফাটাচ্ছে, তাদের মধ্যে কজন দলিতসন্তানকে দত্তক নিয়ে উচ্চশিক্ষিত করে অবস্থান্তর ঘটিয়েছে? 'দলিত' ভাঙ্গিরা যদি শিক্ষিত হয়ে চাকরি করে তাহলে কোনো নেতার বাথরুম, ড্রেন পরিষ্কার করবে কে? স্বাধীনতার পরেই ভারতে দলিত রাজনীতির সূত্রপাত হয়। 'দলিত' ভাঙ্গিদের ধর্মান্তরকরণের অনেক চেষ্টাও করা হয়েছিল। অনেকে ধর্মান্তরকরণের চক্রান্তের স্বীকার হলেও মনেপ্রাণে তারা আজও হিন্দু। সনাতনী সত্যতার সহজ সরল পথটার কোনো বিকল্প হয় না সেটা তারা বোঝেন। মহত্তর সেই মানুষগুলি মুসলমান শাসকদের কাছে মাথা নত করেননি, বিশাল হৃদয়ের সেই মানুষগুলিকে আজ উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের রাজনীতির শিকার হতে হচ্ছে। বিদ্বেষহীন, বৈষম্যহীন, রাষ্ট্রীয়, সনাতনী হিন্দুত্ব যত সক্রিয় হয়ে উঠছে, হিন্দুত্বের নামে সনাতনী চেতনা জাগ্রত হওয়ার চেষ্টা করছে, হিন্দু-হিন্দু ভাই-ভাইয়ের আদর্শে সমগ্র হিন্দুসমাজ এক হচ্ছে তখন রাজনীতির 'ঠিকাদার'রা বর্ণবৈষম্য, উঁচু-নীচুর তাস খেলছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন হওয়ার পর অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কায় ভোগা, রাজনীতি থেকে করে খাওয়া সেইসব রাজনৈতিক দলগুলির মাতব্বররা অস্থির হয়ে উঠেছে। শুধু 'বিরোধের জন্য বিরোধিতা' করা যাদের উদ্দেশ্য, ক্ষমতার অলিন্দে থাকা যাদের বংশপরম্পরার অধিকার, তারা যদি ক্ষমতাহীন হয় তাদের অবস্থা কেমন হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। যে কোনো ভাবে 'যেন তেন প্রকারেণ' সিংহাসনে বসতেই হবে, তার জন্য যা খুশি এরা করতে পারে। কত নীচে নামলে ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা এক শ্রেণীকে নিয়ে এরা রাজনীতি করতে পারে। এক 'মহান' নেতা বলেছেন যে, তারা হাথ রস যাচ্ছেন রাজনীতি করতে, রাজনীতি করা তাদের কাজ। উত্তরপ্রদেশের হাথরসে এক বোনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, সেই বোন পিছিয়ে পড়া বাল্মিকি সম্প্রদায়ের। সেই বোনকে যারা হত্যা করেছে, অত্যাচার করেছে তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরে যে দলিত বোনটিকে নরপিশাচরা সামুহিক ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের চরম শাস্তি হোক। উত্তরপ্রদেশের 'সন্ন্যাসী রাজা' যোগীজী প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম পালন করছেন। সমাজকে কলুষমুক্ত করাই সন্ন্যাসীর কাজ। সংসারী গৃহস্থ রাজনেতারা যখন ব্যাভিচারী হয় তখন গৈরিক শক্তির উত্থান হয়, রণচণ্ডীর রূপ ধরে বিনাশ করতে থাকে আসুরি শক্তিকে। ▮

আসন্ন দুর্গাপূজা অবকাশে স্বস্তিকা-র ২৬ অক্টোবর ও ২ নভেম্বর তারিখের ওয়েবসাইট সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৯ নভেম্বর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

—স্বঃ সঃ

উন্নয়নের পাশ্চাত্য ধারণা বনাম হিন্দু দৃষ্টিকোণ

রাষ্ট্রঋষির বিচারবোধের নিরিখে

কল্যাণ গৌতম

ক্ষণজন্মা-সংগঠক রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ী ভারতীয় কিষান সঙ্ঘেরও প্রতিষ্ঠাতা। কিষান সঙ্ঘের তরফে গত বছর ১০ নভেম্বর ঠেংড়ীজীর জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নিচ্ছিলাম। এক বামপন্থী বিচার ধারার মানুষ আমায় প্রশ্ন করলেন, আপনি জানেন, আপনাদের দত্তপন্থ ঠেংড়ী কখনো পুরস্কার গ্রহণ করেননি, পারিতোষিক নেননি, বড়ো রাজনৈতিক পদ গ্রহণ করেননি, মন্ত্রীসান্ত্রী হননি। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যক্তিপুজো, জন্মদিন পালনের বিরোধিতা করেছিলেন, নেতার নামে জয়ধ্বনির বিপক্ষে ছিলেন! আর আপনি ঘটা করে তার জন্মশতবর্ষ পালন করছেন! এটা কী ঠিক করেছেন, কল্যাণবাবু?

এর থেকে কী বুঝছেন? দত্তোপন্তজীকে ভয় পাচ্ছেন ওরা। ভেবে দেখুন, আমাদের বিচারধারার মানুষেরা অনেকে দত্তোপন্তজীর নাম শোনেননি; কেউ শুনেছেন কয়েক মাস আগে, পড়াশোনা করা তো দূরের কথা! বামপন্থীরা কিন্তু অনেক আগে থেকেই কোমর বেঁধে বসে আছেন— counter narrative তৈরি করবেন বলে! তাই ওনার রচনা, দর্শন কিছু কিছু পড়েছেন।

হ্যাঁ, আমরা ব্যক্তিপুজো করি না, তবে চরিত্রপূজা করি। রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কোনো কার্যকর্তার দেখানো শুভঙ্করী পথের মণিমাণিক্যগুলি আহরণ করি। যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৈচারিক পথকে পাকাপোক্ত করি। সেজন্যই জন্মশতবর্ষ পালন করি; প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করি, তুল্যমূল্য করি, কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিচার করি। তার জন্য সমকালীন এবং অধুনাতন ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করি। জন্মশতবর্ষ পালন করি পুরোনো ধুলো সরানোর জন্য। পুরাতন ঋণ শোধ করার জন্য। আজ যখন রাষ্ট্রঋষির জন্মশতবর্ষ পালন করবো তখন বিকাশের নিরিখে ঝালিয়ে নেবো নতুন শিক্ষানীতি, নতুন কৃষিনীতি, স্বনির্ভর ভারত নির্মাণের ডাক, কৃষকের দ্বিগুণ আয় বৃদ্ধির ডাকও। তুল্যমূল্য করবো দত্তোপন্তজীর উন্নয়ন-ভাবনার সঙ্গে বর্তমান ভারত সরকারের উন্নয়ন-যজ্ঞ একই পথে চলতে সক্ষম হচ্ছে কিনা!

আমরা নিশ্চিত ভবিষ্য-তত্ত্ব ছাড়া ইতিহাস পাঠ যেমন বৃথা (History without futurology would be fruitless), ভবিষ্য-তত্ত্বে ইতিহাসের শিক্ষা না থাকলে, তা-ও শিকড়হীন (Futurology without history would be rootless)।

উন্নয়ন নিয়ে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মত ও পথ আলাদা। ঠেংড়ীজী 'Third Way' বা হিন্দুমার্গকে পুনরায় দেখালেন। এই পথে বিকাশ ও সমৃদ্ধির স্বাতন্ত্র্য কী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অবস্থান কোথায়— তার সুলুকসন্ধান, চিরস্থায়িত্ব, সার্বিক মাঙ্গলিক পথ পরিক্রমার কথা বললেন তিনি। এই শাশ্বত সত্যের পথ খোঁজার মধ্যেই তাঁর জন্মশতবর্ষ পালনের সার্থকতা। যখন বুঝবো সমন্বিত পথই হচ্ছে চিরস্থায়ী ও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য (integral approach is a must for durable and desirable progress and development); যখন ভাবতে সক্ষম হবো যে প্রকোষ্ঠ-চিন্তন বা বেছে বেছে উন্নয়ন করানোটা এক মূল্যহীন অর্থনীতি, আত্মপরাজয়ের অর্থনীতি, তখনই তৃতীয় পথের রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাবো আমরা। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় পথের অসারতা চোখে পড়বে আমাদের কাছে, তখন বুঝতে পারবো Material ও Spiritual মূল্যবোধের মধ্যে সমতা দরকার, সমন্বয় দরকার।

প্রথম ও দ্বিতীয় পথের গোলোক ধাঁধায় হারিয়ে গেলে চলবে না। অভিমন্যু চক্রব্যূহে ঢোকার পথ জানতেন, বেরোনোর পথ জানতেন না, তাই অভিমন্যু বধ হলেন। উন্নয়নের কাজ শিখতে দত্তোপন্তজীকে হতে হয়েছিল কচ-দেবযানী উপাখ্যানের 'কচ'। কীভাবে!

কমিউনিস্ট পরিচালিত ডাক ও তার বিভাগের ইউনিয়নে গিয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারি বনে গেলেন ঠেংড়ীজী। শ্রীগুরুজীর সংকেত ছিল। পৌনে দু'বছর সেখানে থেকে আন্দোলনের ভিতর প্রবেশ করে বুঝতে সক্ষম হলেন। ইউনিয়ন খাড়া করার সকল বিষয় জেনে বুঝে নিলেন। শ্রীগুরুজীর কাছ থেকে আবারও সংকেত এলো— মধ্যপ্রদেশে গিয়ে

'ইনটাক'-এ শামিল হলেন তিনি।

তখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ মিশ্র। তিনি বুঝেছিলেন ঠেংড়ীজীর মতো মানুষের সংগঠনে থাকাটা কতটা জরুরি। সেই প্রয়োজনীয়তায় তিনি মধ্যপ্রদেশে 'ইনটাক'-এর মহামন্ত্রী মনোনীত হলেন। দুই-আড়াই বছর ছিলেন কংগ্রেসের এই শ্রমিক সংগঠনে। সংগঠনের যাবতীয় বিচারধারা জানালেন, কাজ করার পদ্ধতি, সাংগঠনিক চর্চার সুযোগ হলো। জেনে নেওয়া গেল, সঙ্ঘ বিচার ধারায় শ্রমিক সংগঠন কীভাবে দাঁড় করানো যায়। কচ-দেবযানীর আখ্যানে কী দেখি আমরা? গুরু শুক্রাচার্যের কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করার জন্য দেবতারা কচ-কে অসুর-পরিবৃত শুক্রাচার্যের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সাফল্যের সঙ্গে তা লাভ করে ফিরেছিলেন কচ। সংগঠন সঞ্জীবন মন্ত্র আহরণ করে ফিরেছিলেন ঠেংড়ীজীও। তৃতীয়পন্থার পাশাপাশি অন্য পন্থার সীমাবদ্ধতা জানলেন।

বলা হয় ঠেংড়ীজী একজন সামগ্রিক চিন্তক (holistic thinker), সমাজ-মহীরূহরূপ-স্থাপত্যের স্বপ্নদর্শক (visionary social architect)। তিনি একজন উজ্জ্বল আরএসএস তাত্ত্বিক। শ্রীগুরুজী, দীনদায়লজীর পর এতবড়ো চিন্তনবিদ আসেননি। সঙ্ঘের চিন্তানদীতে তিনি কেবল অবগাহন করেছিলেন তাই নয়, নদীকে বেঁধেও দিয়েছিলেন। আরএসএস সম্পর্কিত দৃষ্টিক্ষেপ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী, দীনদয়ালজীর উপলব্ধি সম্প্রসারণ করেছেন। তিনি তাদের বাণীমূর্তি, রাষ্ট্র সাধনায় প্রামাণ্য মূর্ত বিগ্রহ। কেন এ কথা বলা হলো?

কারণ, কোনো একটি ভাষা তার আপন ছন্দে এগিয়ে চলে। ব্যাকরণ তার পিছে ভাষাকে বাঁধতে চায়। ভাষা একটি বহতা নদীর মতো। ব্যাকরণ হলো তার দুই কূল বাঁধানো তীর। ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী নদীর মতো। রাষ্ট্রঋষি হচ্ছেন তার বাঁধানো কূল। যদি Idol-lore বা মূর্তি ভাবনার নিরিখে বলি, ডাক্তারজীরা কাদামাটি ছেনে মানুষ গড়েছেন, ঠেংড়ীজী তৈরি করে গেছেন তার 'পাঠ্যপুস্তক'। Development Economics-এর ওই টেক্সট বুক নিয়ে আজ কিছু শেয়ার করবো।

এই বোধ দাঁড়িয়ে আছে একাত্ম মানব দর্শনের আধারে। বৈষম্য বা খণ্ডিত চিন্তন নয়। অদ্বৈত বা একাত্মভাবের উপর। একাত্ম মানবদর্শনই মৌলিক বিচার; সমস্ত বিষয়বস্তুতেই একাত্মতার প্রচার প্রয়োজন—বিকাশতত্ত্বেও। ঠেংড়ীজী দীনদয়ালজীর একাত্ম মানবদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কী এই মানবদর্শন?

একটি মানুষ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠেন যখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যকরী, সুস্থ সবল থাকে। একটি ফুল তখনই মনোরম যখন তার প্রতিটি পাপড়ির অস্তিত্ব সুন্দর, নান্দনিক। তেমনই একটি সমাজ সার্থক, যখন তার প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা পূর্ণ, পবিত্র ও বিকশিত। সেজন্যই তো মনুষ্য নির্মাণ করতে হয়। ব্যক্তি সাধনা এবং সমাজ-সমষ্টির আরাধনা ভিন্ন নয়, 'অহং'-এর মধ্যে 'বয়ং' সত্তা, 'I'-এর মধ্যে 'We'-এর অনুসন্ধান, 'আমার' মধ্যে 'আমরা'-কে বিরাজিত করালেই সেই সমাজ প্রবলগতিতে এগিয়ে চলে। সমষ্টির নিত্য অনুসন্ধান জরুরি। ভারতীয় সংস্কৃতি একাত্মময়, উন্নয়নও হবে একাত্মের উজ্জ্বল উদ্ধারে। আপাত প্রভেদের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত ঐক্য বিরাজমান। ধরতে হবে সেই ঐক্যের বাণী। বিরোধ, সংঘর্ষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা, পরিপূরকতা এবং অনুকূলতা আমাদের নিত্যকালের সাধনা। উন্নয়ন-যজ্ঞেও এই একাত্মতা খোঁজার নাম একাত্মমানবতাবাদী উন্নয়ন। সমাজকে প্রকোষ্ঠে ভাগ করবো না, আজকের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর স্লোগান সেই অনুষঙ্গেই রচিত।

সঙ্ঘ ও সমাজ সমাব্যাপ্ত। 'Only one consciousness residing among all humanity"। 'অখণ্ডমণ্ডলাকারম্'— ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব একে অপরে বিলীন--- এক বৃহৎ পরিবার। ঠেংড়ীজী বলছেন, পশ্চিম আজ 'Globalisation' বলে চীৎকার করছে, বিশ্বায়ন তো ভারতীয় কনসেপ্ট, হিন্দু হেরিটেজ--- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। 'The whole earth is our family; we identified ourselves with the entire mankind, ourselves as part and parcel of the entire humanity.' ঠেংড়ীজী বলছেন, এখন গ্লোবালাইজেশনের কথা কারা প্রচার করছে? যাদের ইতিহাস 'Inperialistic Exploitation'-এর ইতিহাস, শয়তানরা বাইবেলকে 'quote' করছে। তারা আমাদের গ্লোবালাইজেশন শেখাবে? বলছেন, বর্তমানের বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের লোভ, লুঠ এবং শোষণের প্রতীক; স্বার্থজনিত লাভ পাবার অনর্গল প্রচেষ্টা, যেমন করেই হোক বাজারকে একচেটিয়াভাবে দখল করার চেষ্টা। ঠেংড়ীজী বলছেন স্বদেশী এবং সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলি এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি দেখতে। হবে কোনো চাপের কাছে কোনো দেশের স্বার্থ যেন বিনষ্ট না হয়। WTO (World Trade Organization বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) যখন তৈরি হলো, তাতে বিশ্ববাণিজ্যের নিয়মাবলী রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সবদেশের জন্য স্বচ্ছ ও সমান fair and equal ছিল না। তাই তিনি ডব্লুউটিও-র বিরোধিতা করেছিলেন।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ যখন গঠন করলেন, বিদেশি পুঁজিপতিদের একটি পরিষ্কার বার্তা দিলেন। বিশ্বের যা কিছু সম্পদ বা রিসোর্স, আমেরিকাকে বাদ দিলে, তা সবই রয়েছে সাউথ হেমিস্ফিয়ারে। ক্যাপিটাল যা আছে তা নর্থে। যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, তা কেন পরমুখাপেক্ষী হবে? বিকল্প অর্থনীতির কথা এবং পথনির্দেশ করিয়ে তিনি লিখলেন, 'Third Way'. 'Preace of Hindu Economics'-এ তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করলেন, দেশের অর্থনীতি কোন দিকে যাওয়া দরকার। তিনি Sustainable Development বা চিরায়ত উন্নয়নের কথা বলেছেন। Self Employment System-এর পক্ষে সওয়াল করেছেন, যা নেহরু জামানায় রাশিয়াকে নকল করতে গিয়ে ভারতবর্ষে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি সমস্ত পেশার মানুষের বসবাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, নাপিত, ছুতোর, মুচি ছিল। এখন 'হাবিব' সারা ভারতবর্ষে সেলুন খুলে বসে পড়েছে। বহুজাতিক সংস্থা 'বাটা' জুতোর ব্যবসায় বহুদিন রাজত্ব করেছে। বড়ো বড়ো কোম্পানি ফার্নিচার তৈরি করে, গ্রামের ছুতোরের কাছে যায় না, ছুতোরের ছেলে বড়ো ফার্নিচারের দোকান করে না। আগে গ্রামে তন্তুবায়, কামার, কুমোর, স্যাঁকরা--- সবাই থাকতেন। দত্তোপন্তজী মনে করতেন, দরকার ছিল স্বাধীন ভারতে এদের সকলকে Skil development করিয়ে দেওয়া, মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা করা, তা না করে নেহরু রুশ মডেলে আইটিআই গড়ে, কিছু আধা-কারিগর বানিয়ে শিল্পের জন্য নতুন ভারত গড়তে চাইলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং সম্পূর্ণ কাঠামো ভেঙে পড়লো, কারিগর সমাজ নষ্ট হয়ে গেল। কারখানায় কাজের লোভে সামান্য ট্রেনিং নিয়ে ছাত্রেরা ছুটলো মাসকাবারি চাকরি করতে, কলের সস্তা জিনিস বাজারে এলো, গ্রামে কামারের জিনিস, কুমোরের জিনিস আর বিকোলে না। ঠেংড়ীজী বলতেন, দেশীয় জিনিস যদি সামান্য নিম্নমানেরও হয়, তাই পরম আদরে ব্যবহার করা দরকার।

আত্মনির্ভর ভারত গঠনের জন্য স্বদেশী চিন্তাচেতনার প্রয়োজন এসে পড়েছে। আর্থিকক্ষেত্রে দেখতে হবে অঞ্চলে অঞ্চলে সমীক্ষা করে কী কী করা যায়, কতটুকু আছে সেই অঞ্চলে, কতটুকু নেই, কতটুকু ছাড়াই দৈনন্দিন জীবন চলে যায়, কতটুকু সেই অঞ্চলেই উৎপাদন করে নেওয়া যায়।

১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ রাজস্থানের কোটা শহরে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ। তার ধ্যেয় বাক্য— 'কৃষিমিৎ কৃষস্ব' ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত, Do farming itself, শুধু কৃষিকাজই করো। কৃষিকাজ সনাতনী ভারতবর্ষের চিরায়ত সেবাকাজ, সম্মানের কাজ, আত্মনির্ভরতা ও আত্মগরিমার কাজ। 'কৃষি' থেকেই এসেছে 'কৃষ্টি' কথাটি। এর প্রতীক চিহ্ন বিশ্বভূমণ্ডলে অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্র, তাতে লাঙ্গলের চিহ্ন আঁকা। রাজনীতি বর্জিত অরাজনৈতিক সংগঠন করে তুলতে চাইলেন। কিষানের উত্থান ও উন্নতি ছাড়া যে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রের উত্থান সম্ভব নয় তা বুঝেছিলেন। কাজের লক্ষ্য স্থির হলো— 'দেশ-কা হাম ভাণ্ডার ভরেঙ্গে, লেকিন কিমত পুরা লেঙ্গে।' দেশের খাদ্য ভাণ্ডার ভরিয়ে তোলা হবে, কিন্তু কৃষক যেন পুরো দাম পায়। যদি নতুন কৃষি আইন রূপায়ণ করে কৃষককে দামের গ্যারান্টি দিতে পারি, ন্যায্য দাম তুলে দিতে পারি— তবে তা শতবর্ষে ঠেংড়ীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হবে।

দত্তপন্তজী 'Swadeshi'-র সংজ্ঞা দিচ্ছেন, 'as the practical manifestation of patriotism'। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা, National Spitit আনা দরকার। সচরাচর আমরা স্বদেশী বলতে কেবল পণ্য ও পরিষেবাকে বোঝাই। তিনি বলেন, 'Swadeshi not merely an economi affairs confined to material goods but a broad-based ideology embracing all departments of natonal life.' 'স্বদেশী মানে আত্মনির্ভরতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সামগ্রিক স্বাধীনতা বজায় রাখা।

স্বদেশী অর্থনীতিতে তিনি জোর দিয়েছেন—

১. মূল্যবোধ ভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা।

২. আর্থিক সমানতার সুযোগ।

৩. প্রকৃতিকে শোষণ নয়, দোহন।

৪. আত্ম-রোজগার, স্ব-নিযুক্তি, বেতনভোগী কর্মচারী হয়ে ওঠা নয়।

ঠেংড়ীজী লিখছেন, প্রয়াগে নেহরুর বাড়িতে গান্ধীজী গেছেন। নেহরু গান্ধীজীর হাতে জল ঢালছেন। কিছুটা জল হাতের বাইরে পড়লো। বিরক্তি প্রকাশ করলেন গান্ধীজী। নেহরু বলছেন এটা আর এমন কী বড়ো কথা, আমাদের এখনো তো গঙ্গা বয়ে চলেছে। গান্ধীজী বলছেন, গঙ্গা তো কোনো একজন ব্যক্তির জন্য বইছে না। দুই তীরের মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সকলের জন্য বয়ে চলেছে। গান্ধীজী বলতে চাইছেন, অতিরিক্ত জলের ব্যবহার বন্ধ করো। জল অপচয় করো না। 'ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ' গঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে নানান বিষয়ের সঙ্গে বলা হয়েছে জল-সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করতে হবে। ঠেংড়ীজীর অনুভব-কথনকে মান্যতা দিয়েই এটা করা হয়েছে।

প্রকৃতিকে শোষণ না করার কৃষিকাজ হলো অর্গানিক ফার্মিং। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ মনে করে জৈবিক ক্ষেতির ব্যাপকতা আমাদের আত্মনির্ভর করবে, কৃষিতে খরচ কমবে, সারের জন্য সরকারকে ভরতুকির বিপুল টাকা গুনতে হবে না। বীজ-কীটনাশকের দাম ক্রমেই কৃষকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাঁর স্থাপিত কৃষক সংগঠন দাবি করছে National Seed Policy রূপায়ণের — বীজে কৃষকের অধিকার। কৃষক নিজের বীজ নিজেই তৈরি করে নিতে পারে, সরকারি খামার থেকেও যাতে বীজ পায়। ঠেংড়ীজীর স্বপ্নপূরণ করতে হলে আত্মনির্ভর কৃষি চাই। ভারতের গ্রামগুলিকে যথাসম্ভব উৎপাদন, আয়োজনে, জীবনচর্যায় আগের মতোই স্বাবলম্বী করে তোলা চাই।

আর্থিক নীতি, সমৃদ্ধির দিক বদলের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের সব কিছুকেই ভাবনার মধ্যে আনতে চেয়েছেন। পারিবারিক সিস্টেম, মূল্যবোধ, ভোগবাদের বৈপরীত্য, পরিবেশবান্ধবতা, সমাজের অ-সক্রিয় সদস্য যেমন শিশু, বৃদ্ধ ও দিব্যাঙ্গদের যত্ন, উন্নয়নের কেন্দ্রিকতা ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যেকার ভারসাম্য রক্ষা— সবই চিন্তনের মধ্যে রাখতে হবে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ প্রযুক্তি বা Appropriate Technology-র কথা বলেছেন। কোনো প্রযুক্তিকে চালু করতে হলে দেখে নিতে হবে তা পরিবেশ ও লোকবান্ধব কিনা, খরচ-সাশ্রয়ী কিনা, টেকসই কিনা। কারণ বারবার অ-সামঞ্জস্যের প্রযুক্তি বদল করা সম্ভব নয়।

Self sufficiency নয়, Nation self-reliance চাই, রাষ্ট্রের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব চাই, সকলের Basic needs পূরণের কথাও থাকবে— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, গ্রাম-শহরের উন্নয়নের মধ্যে অন্ত্যোদয়ের কথা বলেছেন, অর্থাৎ সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীকে তুলে ধরার কথা বলেছেন।

আমরা জানি, ঠেংড়ীজী 'অখিল ভারত গ্রাহক পঞ্চায়েত'-এরও সংস্থাপক ছিলেন। শুধু কৃষক-শ্রমিকের কথা নয়, সমস্ত ভোক্তার কথাও ভেবেছেন তিনি, বলেছেন Consumer interest is closet to the national interest, সমস্ত আর্থিক বিষয়ে উপভোক্তার কথাও ভাবতে হবে। এই যে নতুন বিলে উৎপাদন ও উপভোক্তার মধ্যে যথাসম্ভব দালাল শ্রেণী বিলোপের চেষ্টা হয়েছে, তাতে কৃষক পণ্যের দাম বেশি পাবে তাই নয়, মধ্যস্বত্বভোগীদের নানান হাত ঘুরতে হবে না বলে গ্রাহকও কমদামে কৃষিপণ্য কিনতে সক্ষম হবে। তিনি দাবি তুলেছিলেন 'the sellign price should be printed on every product and also the cost of production of that product', কোনো শিল্পপণ্যের উৎপাদন মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য লিখে দিতে হবে। এতে কী লাভ? দেশের উৎপাদক ও খুচরো বিক্রেতারা কী পরিমাণ লাভ ঘরে তুলছে, তার চালচিত্র পরিষ্কার হবে আমাদের কাছে। বিদেশি পণ্যের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হলে বোঝা যাবে কত টাকা লাভ নিয়ে যাচ্ছে তারা। তিনি দাবি তুলেছিলেন কোম্পানিগুলি Cost Audit Report প্রকাশ করুক। এই রিপোর্ট যেন Bureau of Industrial Costs

and Prices-এর কাছে জমা পড়ে, সকলের কাছে উপলব্ধ হয়, যে যা খুশি দাম ধার্য করবে— সেটা চলবে না।

অরাজনৈতিক 'ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ' যখন তৈরি করলেন, তার নীতিবাক্য রাখলেন, রাষ্ট্র কা উদ্যোগীকরণ Industrialize the nation, শ্রমিকোঁ কা রাষ্ট্রীয়করণ Nationalize the labour, উদ্যোগোঁ কা শ্রমিকীকরণ Labourize the Industry। এর মানে হলো জাতীয় স্বার্থ সর্বাগ্রে থাকবে, Supreme interest। রাষ্ট্রের স্বার্থ প্রথমে দেখা হবে, তারপর শিল্পস্বার্থ ও শ্রমিক স্বার্থ। কমিউনিস্টরা যেখানে স্লোগান দেয়, 'চাহে যো মজবুরি হো, হামারি মাঙ্গে পুরি হো' Whatever may be the difficulties, our demands must be fulfilled, সমস্যা যাই হোক, আমাদের মজুরি চাই। ঠেংড়ীজী মজদুর সঙ্ঘের স্লোগানে বললেন, 'দেশকে হিতমেঁ করেঙ্গে কাম, কামকে লেঙ্গে পুরে দাম', দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করবো এবং কাজের জন্য পুরো দাম নেবো, We will work in the interest of the country and take full wage for the work done।

শিল্প, কৃষি নানান ক্ষেত্রে ভারতীয় বামপন্থীরা 'Disguised Unemployment' -এর সূচনা করে গেছে, ছদ্মবেশী অকর্মসংস্থান বলে এটাকে। Two many workers are filling two few jobs। কলকারখানায় ভূস্বামীর জমিতে যে কাজটি ৫ জনে করে ফেলার কথা, তা করেছে ৮ জন। এই ৮—৫=৩, এটি হলো Disguised Unemployment, তাতে কোনো প্রকল্পই লাভের মুখ দেখতে পারে না, মুখ থুবড়ে পড়ে, একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়। সার্বিকভাবে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

ঠেংড়ীজীর অর্থনৈতিক বিচার ও উন্নয়ন ধারণার মধ্যে যে চুম্বক, magnet, abstract, তা হলো এটি একটি Hindu Paradigm। এখন উন্নয়নের পাশ্চাত্য ধারণা এবং হিন্দু বা প্রাচ্য ধারণার মধ্যে তুলনা করবো কীভাবে? ১৯৯৭ সালে তিনি এবিভিপি-র জাতীয় কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দুই উন্নয়ন ধারণার ফারাক তুলে ধরেছিলেন। তা বিন্দু আকারে পরিবেশিত হলো।

১. পশ্চিমের চিন্তন প্রকোষ্ঠবদ্ধ, Compartmental; হিন্দুচিন্তন Integrated, সমন্বিত।

২. পশ্চিম কেবল 'মেটেরিয়াল'-এর কথা বলে। এদেশ বলে Physical, mental, intellectual, spiritual— সার্বিক উন্নয়নের কথা।

৩. পশ্চিম জোর দেয় অর্থ, কামের উপর। পূর্বের জোর পুরুষার্থের উপর, চতুষ্টয়ের উপর।

৪. পাশ্চাত্যের কাছে সোসাইটি বলতে আত্মকেন্দ্রিক মানুষের ক্লাব, হিন্দুচিন্তনে সমাজ বলতে সকলের অবস্থান, একটি দেহের মধ্যে থাকা নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন।

৫. একার সুখ নয়, উন্নয়নের চাবিকাঠি সকলের সুখে— সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ'।

৬. পশ্চিমের উন্নয়নে অধিগ্রহণের কথা Acquisitiveness-এর কথা আছে। হিন্দু ধারণায় আছে অপরিগ্রহ, অগ্রহণ, মুক্ত থাকার কথা, Non possessiveness।

৭. পশ্চিম Profit motive (লাভ অভিসন্ধির) কথা বলে, বলে Consumerism-এর কথা, Exploitation-এর কথা, হিন্দু ধারণায় Service motive (সেবার উদ্দেশ্য) আছে, ভোগের কথা নেই, আছে অন্ত্যোদয়ের কথা, সমাজের শেষ মানুষটির মঙ্গলের কথা।

৮. পশ্চিম right oriented-এর কথা বলে, অধিকার ফলানোর কথা, হিন্দু ধারণায় Duty-oriented-এর কথা আছে, কর্তব্যের ডাক, কর্তব্যের প্রেরণা।

৯. পশ্চিম কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতার কথা শোনায়, তার নানান ছলাকলা, হিন্দু ধারণায় আছে উৎপাদনের প্রাচুর্য, স্বাভাবিকতা।

১০. একচেটিয়া পুঁজিবাদ জুড়ে থাকে পশ্চিমি ধারণার মধ্যে, বাজারের প্রতারণাও পাশ্চাত্য ধারণা। আর পূর্বে পুবের বাতাসের মতো মুক্ত প্রতিযোগিতা free competition, কোনো ম্যানুপুলেটেড বাজারের স্থান নেই এখানে।

১১. মজুরির কর্মসংস্থান বা Wage-employment নিয়েই দিনাতিপাত পশ্চিমের, পুবের ব্যবস্থা ছিল স্ব-রোজগারের, Self-employment-এর।

১২. প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারার বর্ধিত মিছিল হচ্ছে পশ্চিমের অনুভূতি Western concept; বিশ্বকর্মার চির-উদ্ভব বা আপন পেশায় নিত্যদিনের কাজের মানুষ গড়ে ওঠা হিন্দু-ধারণা।

১৩. পশ্চিমি দুনিয়া প্রকৃতিকে শোষণ করে, আর হিন্দু সমাজ প্রকৃতিকে দোহন করে; The milking of mother nature।

১৪. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবক্তারা ব্যক্তি-সমাজ-পরিবেশের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্বই খুঁজে বেড়ায়। হিন্দু-উন্নয়নের ধারণার মধ্যে খোঁজা হয় হারমোনি, সমন্বয়।

ঠেংড়ীজী বলছেন আমরা প্রায়ই যে পরিভাষা শুনি যেমন— এজেন্ট, ব্র্যান্ড, কপিরাইট, ট্রেড নেম, লাইসেন্স, কোটা, প্রোটেক্টিভ টারিফ, কার্টেল, পুল, ট্রাস্ট, হোল্ডিং কোম্পানি, ইনকর্পোরেটেড বোর্ড অব ডাইরেক্টস্, ইনকর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি— এগুলি সব পাশ্চাত্য থেকে আমদানি। তিনি বলছেন আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদেরা অন্ধভাবে পশ্চিমি প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে। অথচ তারা স্বদেশীয় বৃদ্ধি তত্ত্বে (Growth Theory), দেশীয় প্রতিবেশে কাজ করতে সক্ষম, কিন্তু তারা তা করছেন না। তাদের চিন্তা নিজের চিন্তা নয়, ধার করা চিন্তা। দেশীয় অর্থনীতিবিদেরা পৌনঃপুনিক মানসিক ধারে ঋণী, Recurrent rent জমে আছে। এই ধার শোধ করতে পারলেই আত্মনির্ভর ভারত গড়া যাবে।

পশ্চিমি উন্নয়নের মডেল অনুসরণ করলে যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব হবে না। বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'এক গাছের ছাল/অন্য গাছে লাগে না', অর্থাৎ সামঞ্জস্য বা compatibility-র অভাব হয়। যা কিছু বিদেশি তত্ত্ব, প্রযুক্তি আনলেই দেশ সমৃদ্ধ হবে না। নতুন শিক্ষানীতিতে ক্লাস সিক্স থেকেই পেশাগত/কারিগরি শিক্ষার কথা আছে। অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ছাত্রেরা কাজ শিখবে, খানিকটা আয় করতে শিখবে। কৃষক সন্তানকে 'চাষা' বলে অপমান করেছি, সেই অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করছি এখন। কৃষককে ন্যায্য দাম দিইনি, ফড়ে-দালালশ্রেণীতে ভরে গেছে বাজার। কৃষিতে লাভের অঙ্ক ভুলে গেছে চাষি, পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে কৃষকের ছেলে দূরে চলে গেছে, গাঁয়ের ছেলে শহরে রিকশা টানে তবুও চাষ করে না। ঠেংড়ীজী যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় কিষানকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, তার স্বরূপ সন্ধান করে যদি তা বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে দেশ স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাবে, দত্তোপন্তজীর জন্মশতবর্ষ পালন সার্থক হবে। ■

করোনাকালেও হিন্দুদের ওপর হামলা চলছে বাংলাদেশে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে অক্টোবর পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪৪০। আর আক্রান্ত ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৫১ জন। মোট পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ৪১ শতাংশ। মহামারীতে গোটা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বিপর্যস্ত অর্থনীতি। কিন্তু এর মধ্যেও থেমে নেই সাম্প্রদায়িক হামলা, অত্যাচার, অপহরণ ও ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, জায়গা-জমি দখল, মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর, দেশ ত্যাগ করার হুমকি। এসব হামলার জন্য মুখ্যত দায়ী করা হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগকে, তারপরেই বিএনপি-কে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ সূত্রে এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বিগত মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর— এই সাত মাসের সাম্প্রদায়িক হামলার যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে ফুটে উঠেছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা। এই সাত মাসের চিত্রে দেখা যায় হত্যা করা হয়েছে ১৭ জনকে, ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৩০ জন, নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ৩ জন, অপহরণ করা হয়েছে ২৩ জনকে, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে ৭ জনকে, ২৭টি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে, ২৩টি মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, শ্মশান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটেছে ৫টি, বসতভিটা, জমিজমা, শ্মশান থেকে উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ২৬টি। জায়গাজমি দখলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৩৪ জনকে, গ্রামছাড়া করা হয়েছে ৬০টি হিন্দু পরিবারকে।

এছাড়া হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ১০ জনকে, হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ১১ জনকে, ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ৬ জনকে, অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে ২ জনকে, নিখোঁজ হয়েছেন ৩ জন, বসতভিটা,

জমিজমা, শ্মশান থেকে উচ্ছেদের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ৭৩টি, ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে ৪ জনকে, বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে ৮৮টি, হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ২৪৭ জন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ত্রাণ বিতরণকালে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে ২০টি পরিবারকে এবং হযরত মহম্মদকে কটূক্তির মিথ্যা অভিযোগে আটক করা হয়েছে ৪ জনকে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাংলাদেশে নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী করোনার ভয়াবহতাও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ করতে পারেনি। এসব হামলা ও নির্যাতনের মূল লক্ষ্য হলো ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে উচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা যাতে বাংলাদেশ সংখ্যালঘুশূন্য দেশে পরিণত হয়। তিনি বলেন, পাকিস্তানি আমলের সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষের এ ঘৃণ্য চক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তান আজ বলতে প্রায় হিন্দুশূন্য। বাংলাদেশে এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে নিপতিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। অ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত এই পরিস্থিতি সুগভীর বিবেচনায় আনার জন্যে সরকার ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রীদাশগুপ্ত বিগত নির্বাচনের পূর্বে সরকারি দল আওয়ামি লিগ প্রতিশ্রুত ‘সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন’ প্রণয়নে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারের প্রতি দাবি জানান। তিনি বলেন, হামলাকারীদের বিচার না হওয়ার কারণে তারা আরও বেপরোয়া। রাজনৈতিক পরিচয় যারা বহন করে তাদের গায়ে হাত দিতে আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। ফলে তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে, হিন্দুদের ওপর হামলা কিংবা তাদের জায়গাজমি দখল করলে কিছু হবে না। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে সরকারকে কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে হবে, আইনকে নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে। তবে শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাদের এই ভূমিকা সম্প্রসারিত করতে হবে। অপরাধীদের দৃশ্যমান বিচার হতে হবে। বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে।

বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচের প্রধান অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, সরকার সাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধে যদি সত্যিকার ভাবে আন্তরিক হয় তাহলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সেই বার্তা দিতে হবে। ■

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

উপাসনা রূপে ধর্ম :

উপাসনা জীবনের এমনই একটা অনিবার্য অঙ্গ যে তা ইস্ট দেবতা হয়ে ব্যক্তির সঙ্গে, কুলদেবতা হয়ে কুলের সঙ্গে, গ্রাম দেবতা হয়ে পুরো গ্রামের সঙ্গে মিশে গেল। বিভিন্ন সমূহের বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হলো। সদাচার, সদ্‌গুণ, সহযোগ ,সেবাকাজ, উৎসব, মেলা সৎসঙ্গ, কথা, কীর্তন ,যাত্রা, মন্দির ইত্যাদিরূপে এই সম্প্রদায়-ধর্ম সমাজব্যাপী ছড়িয়ে গেল। আচার ধর্মের অন্য একটা দিক হলো দান, অন্নসত্র, ধর্মশালা, জলাশয় ইত্যাদির নির্মাণ যা আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

আজ অন্য ভালো কথার মতো উপাসনা অথবা সম্প্রদায়কেও বিকৃত করা হয় এবং বিকৃত রূপে উপস্থাপন করা হয় ও বিবাদের বিষয়ে পরিণত করা হয়। জীবন ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না এটা খুব সহজেই বোঝা যায়। তবু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মিছিল করা হয় এবং এজন্য দেশের সংবিধানের দোহাই দেওয়া হয়ে থাকে। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ নেই, যা আছে তা হচ্ছে পন্থ নিরপেক্ষ। তবু ধর্মের নামে বাদবিবাদ দাঁড় করিয়ে কোলাহল করা হয়। পন্থ অর্থাৎ সম্প্রদায়ও ছোটো নয়, কিন্তু সর্বপন্থ সমাদরের বিবেক ও সৌজন্য ছেড়ে তার নামে ঝগড়া করা হয়ে থাকে এবং সার্বজনিক কথাবার্তায় তাকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। এই অবস্থা অত্যন্ত ঘাতক, এর উপায় করা দরকার।

ধর্মপুরুষার্থ সাধনার বিষয়। এটা শিক্ষার মুখ্য বিষয়। এটা কাম ও অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার প্রতিষ্ঠা দেয়। এটা মানুষের সর্ব প্রকারের উন্নয়ন ঘটায়। এটা জীবনের পরম লক্ষ্যকে পাবার দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এমন ধর্মের রক্ষা করা দরকার। আমরা যখন ধর্মকে রক্ষা করি তখন ধর্মও আমাদের রক্ষা করে। ধর্ম রক্ষা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। মহাভারতে বার বার অনেক মুখেই বলা হয়েছে, 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' অর্থাৎ যেখানে ধর্ম সেখানেই বিজয়।

এটা এমনই সর্বদা সর্বরক্ষক ধর্ম যা মানুষের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও আচরণ করা উচিত।

ধর্মপুরুষার্থের জন্য শিক্ষা :

শিক্ষা হচ্ছে তাই যা ধর্ম পথে পরিচালিত করে। এমন একটা বাক্যে শিক্ষার বর্ণনা করা যেতে পারে। বহু প্রসিদ্ধ সুভাষিত আমরা তো জানি,

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্মেনহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের দিক থেকে পশু ও মানুষ সমানই। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু ধর্মের কারণেই। ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান। অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্ম শেখানো। এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষা দ্বারা মানুষকে ধর্মের পালন করতে হবে। ধর্মপুরুষার্থ হেতু শিক্ষার বিষয়গুলো হচ্ছে :

১. ধর্মকে আজ বিবাদের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। এজন্য ধর্ম শিক্ষার স্থানে মূল্যশিক্ষা এরকম শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেকবার তাকে নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে ওটা বাস্তবে ধর্ম শিক্ষাই।

২. ধর্মশিক্ষা সম্প্রদায়ের শিক্ষা নয়। পূর্বেই আমরা ধর্মের ব্যাখ্যা দেখেছি। তার সব অর্থেই ধর্মের শিক্ষাই হচ্ছে ধর্মপুরুষার্থের শিক্ষা।

৩. ধর্মপুরুষার্থের শিক্ষা ছোটো বড়ো সবার জন্য অনিবার্য হওয়া দরকার। সে ডাক্তার হোক বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, সে মন্ত্রী হোক বা সরকারি কর্মচারী, সেই সাহিত্যই পড়ুক অথবা চিত্রকলা, সে বাণিজ্যই পড়ুক থবা তত্ত্বজ্ঞান, সে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্তই পড়ুক অথবা উচ্চবিদ্যাবিভূষিত হোক, সে মজদুর হোক অথবা শিল্পপতি, ছাত্রদের ধর্মপুরুষার্থের শিক্ষা অনিবার্যরূপে লাভ করা দরকার, কেননা ধর্মই হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তি।

৪. ধর্ম কেবল জানবার বিষয়ই নয়, তা মানসিকতার ও আচরণের বিষয় । সেই রূপেই শিক্ষা পরিকল্পনা করা দরকার।

৫. বাল্যাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসগুলো গড়ে ওঠে। ওই সময়েই ধর্মশিক্ষা আচারের রূপে দেওয়া দরকার। এটা এতটাই অনিবার্য হওয়া দরকার যে, যতদিন আচরণ শুদ্ধ ও পবিত্র না হচ্ছে, সত্য, সততা, সংযম, বিনয় দান, দয়া ও পরোপকারের মানসিকতা বিকশিত না হচ্ছে, ততদিন প্রথাগত শিক্ষায় প্রবেশাধিকারই পাওয়া উচিত নয়। এমনিতে তো চরিত্র ও সদ্‌ব্যবহারের প্রমাণপত্র উচ্চশিক্ষা ও সরকারিতে চাওয়া হয় কিন্তু তাকে অনেকটাই প্রথামাত্রে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে সৎচরিত্রের না কোনো ব্যাখ্যা আছে আর না কোনো আশা। এর অর্থ এটাও যে, সবার চরিত্র ও সদ্‌ব্যবহারের প্রয়োজন তো পড়ে কিন্তু তা লাভ করবার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। স্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিকাশের মাপদণ্ড করলে তো এটা প্রাপ্ত করা সম্ভবও নয়, কারণ ধর্মশিক্ষার সূত্রপাতই হচ্ছে স্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগের মধ্য দিয়ে।

৬. প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ জে কৃষ্ণমূর্তি আজকের বৌদ্ধিক জগতের ব্যবহারের বর্ণনা

করতে গিয়ে বলেছেন, মনে করুন আপনাকে যেতে হবে দক্ষিণ দিক কিন্তু আপনি বসে রইলেন উত্তরে যাবার গাড়িতে এবং গন্তব্যস্থান না আসায় ব্যবস্থাকে দুষতে থাকলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই হচ্ছে। আমার যাওয়া তো দরকার পূর্বে কিন্তু পরোক্ষে যাত্রা চলছে পশ্চিমাভিমুখে। আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পেরে তখন সরকার, কলিযুগ, বাজারিকরণ, ইউরোপ ইত্যাদিকে দোষ দিয়ে থাকি। লক্ষবার বোঝালেও অথবা বুঝলেও আমরা অভিমুখ পালটাবার সাহস জুগিয়ে উঠতে পারছি না। অধর্মের রাস্তায় চলে আমরা ধর্মের বা আজকের ভাষায় বললে মূল্যবোধের অপেক্ষা করে থাকি। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিমুখ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

৭. যোগের প্রথম দুটি অঙ্গ – যম ও নিয়ম প্রকৃতপক্ষে ধর্মশিক্ষাই। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সৃষ্টিগত ব্যবহার ঠিক করবার জন্য ওটা হচ্ছে সার্বভৌম মহাব্রত। একে আচাররূপে উপস্থাপিত করা যোগ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং সমস্ত শিক্ষার আধারও বটে। আজ আমরা যোগকেও শারীরিক শিক্ষার অঙ্গ বানিয়ে চিকিৎসা প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতার বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছি। চেষ্টা করে এর পরিবর্তন করা দরকার।

৮. সব বিষয়গুলোর সঙ্গে ধর্ম শিক্ষাকে যুক্ত করা দরকার। ওটাকে আচাররূপে নয় বরং বিষয়ের স্বরূপ ও সিদ্ধান্ত সমূহের মূল্যনিষ্ঠ রূপে। উদাহরণস্বরূপ, আজ অর্থশাস্ত্রে পড়ানো হয় যে, অর্থশাস্ত্রের ধর্ম অথবা মূল্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ওই স্থানে অর্থশাস্ত্রের শিক্ষা ধর্মের অনুসারী হওয়া উচিত এটাই সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। দান ও সঞ্চয় অর্থ ব্যবহারের অনিবার্য অঙ্গ হওয়া দরকার। বন্ধুবান্ধবকে না দিয়ে কোনো কিছু ভোগ করা উচিত নয়।

৯. ধর্ম ও অধর্মকে জানবার বিবেক বিকশিত করা দরকার। ধর্মকে স্বীকার ও অধর্মকে ত্যাগ করার জন্য সদাউদ্যত থাকার দরকার। ধর্ম রক্ষার জন্য সদা তৎপর থাকা দরকার। বিপত্তিকালেও ধর্মকে ত্যাগ না

করবার মতো ধর্মনিষ্ঠা বিকশিত করা দরকার। উদাহরণ— আজ ছোটো বড়ো সকলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হলেও বা সংস্কার বিরুদ্ধ অখাদ্যকেও ভক্ষণ করছেন, কারণ হচ্ছে সংযম ও শুচিতার প্রতি আগ্রহের অভাব। বিদেশি দ্রব্য ক্রয় করলে আমাদের দেশের আর্থিক ক্ষতি এটা জানা সত্ত্বেও তারা সস্তা ও আকর্ষক বিদেশি দ্রব্য ক্রয় করে থাকেন, কেননা দেশভক্তির অভাব রয়েছে। ধর্মের পরীক্ষা আচরণ দ্বারাই হয়ে থাকে।

১০. জগতের বিভিন্ন ধর্মের অধ্যয়নও করা দরকার। সব ধর্মের মধ্যে কী সমানতা ও কী বিভেদ রয়েছে তা সম্যকরূপে জানা দরকার। নিজের ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বও জানা দরকার। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য কী, সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার অর্থ কী, সম্প্রদায় কীভাবে তৈরি হয়, সম্প্রদায়গুলোর মাঝে কেন বিবাদ হয়ে থাকে, ধর্মীয় বিদ্বেষ কীভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠে, ধর্মযুদ্ধ কী, ধর্মযুদ্ধ ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্য কী, আজ ধর্মের যে অবস্থা তার পরিবর্তন করার দরকার হলে আমাদের ভূমিকা কী হবে-- এসবই ধর্মপুরুষার্থ শিক্ষার অঙ্গ হওয়া দরকার।

এইভাবে ধর্মপুরুষার্থের শিক্ষা হচ্ছে সম্পূর্ণ শিক্ষার সার। এটা পরমপুরুষার্থের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব করে দেয়।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্যপ্রকাশ গুপ্ত, (প্রাক্তন অধ্যাপক)

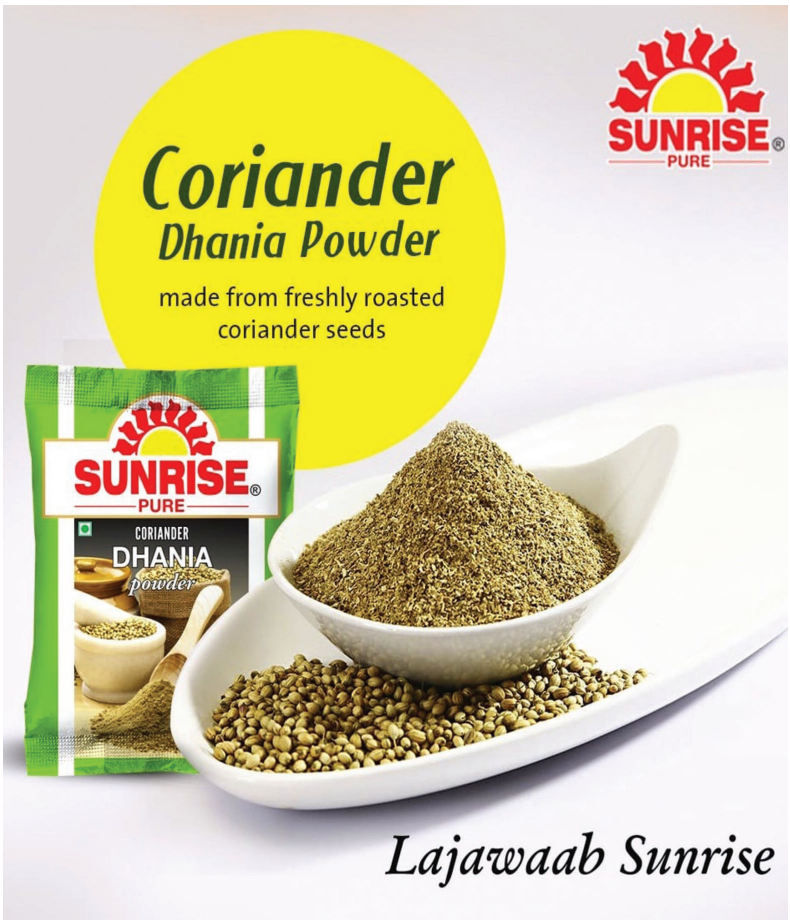

বিশেষ প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গে ক্রমবর্ধমান লাভজিহাদের ঘটনা

তরুণ কুমার পণ্ডিত

লাভ জেহাদ নিয়ে সর্বপ্রথম কেরল রাজ্যে হইচই এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কিছু ঘটনা দেশের মানুষ জানতে পারলেও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক লাভ জেহাদের ঘটনা আমাদের অনেকের কাছে অজানা। মুসলমান যুবকেরা হিন্দু নাম নিয়ে হাতে বিপত্তারিণী পূজার লাল সূতোর মতো জড়িয়ে হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে ভাব জমানোর পর তাকে বিয়ে করে এবং ধর্মান্তরিত করে। প্রথমে হিন্দু মহিলাটি ধর্ম পরিবর্তন করতে না চাইলেও পরবর্তীতে তাকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়, না হলে চলে অকথ্য নির্যাতন। তারপর একটি কিংবা দুটি সন্তান হবার পর, শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী সেই মুসলমান যুবক অন্য আর একটি মহিলাকে বিয়ে করার উদ্যোগ নেয়। আর তখন থেকেই শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। লাভ জেহাদের শিকার অনেক হিন্দু মহিলা স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে, কেউ-বা বাবার বাড়ি পালিয়ে আসে।

সম্প্রতি মালদা জেলা-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে লাভ জেহাদের ঘটনা চরম সীমায় পৌঁছেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কোর্টে গেলেই দেখা যায় লাভ জেহাদের জন্য হিন্দু মহিলাদের ভুরি ভুরি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আদালতে জমে রয়েছে। মালদা জেলার মুসলমান অধ্যুষিত সুজাপুর ও কালিয়াচকে এই লাভ জিহাদের ঘটনা মাত্রাতিরিক্ত ছড়িয়েছে। কেবলমাত্র স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রীরাই নয়, বহু হিন্দু গৃহবধূরাও তাদের সন্তানসন্ততি ছেড়ে মুসলমানদের সঙ্গে প্রলোভনে পড়ে চলে যাচ্ছে। মালদা জেলার ৯৫ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত সুজাপুর এলাকা, এক্ষেত্রে লাভ জেহাদের

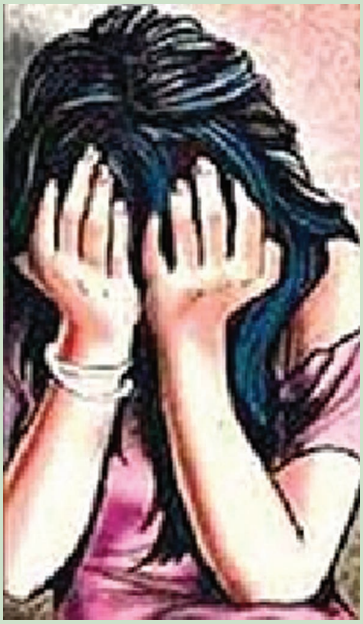

স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। সবাই জানেন, সুজাপুরের মানুষ ভারতবর্ষের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাদের পাওয়া যায় না। শ্রমিকদের কাজ ছাড়াও অন্য যে কোনো ব্যবসায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তাদের অবাধ বিচরণ। বাইরে থাকার সময়ে অনেকেই নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিয়ে সুজাপুরের সেই মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িতে অবাধে মেলামেশা করে এবং সুযোগ বুঝে সেই বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসে। একটি বেসরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে, সুজাপুরের প্রতি ২৫টি পরিবার পিছু একজন হিন্দু মেয়ে রয়েছে যারা লাভ জেহাদের শিকার হয়ে মুসলমান যুবককে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। ইদানীং এরকম বেশ কিছু হিন্দু মহিলা তাদের উপর দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের কথা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছেন। যেহেতু মুসলমান সমাজে নারীদের কেবল সন্তান জন্ম দেওয়ার মেসিন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না, তাই ছেলে-মেয়েদের নিজেদের কাছে রেখে ধর্মান্তরিত হিন্দু মেয়েটিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় অথবা মেয়েটি অত্যাচার সহ্য করতে না পরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। হিন্দু স্ত্রীর গর্ভের সন্তানটিকে একটু বড়ো হলেই শ্রমিকের কাজে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ভারত দখল করার চক্রান্ত তো মৌলবি, ইমাম ও অন্যান্য মুসলমান রাজনীতিবিদদের মজ্জাগত। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের মেয়েরাই লাভ জেহাদের পাল্লায় পড়ে তাদের জীবন বিভীষিকাময় করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে দীর্ঘ ৮ বছর মুসলমানের সংসার করার পর নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে পালিয়ে এসে মালদার এক চিকিৎসকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করছেন। হিন্দু পরিবারগুলোতে হিন্দু আচার পদ্ধতি, পূজা অর্চনা ও হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা না করে বাবা-মা চাকরি ও অর্থ উপার্জনকেই প্রাধান্য দেওয়ার জন্যেই এই লাভ জেহাদের মতো নিষ্ঠুর ঘটনার এত বাড়বাড়ন্ত বলে অনেকেই মনে করছেন। এছাড়াও লাভ জেহাদ নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা এখনও আমাদের রাজ্যে হয়ে ওঠেনি। আমাদের রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলো ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ফলে তেমনভাবে জেহাদিদের দূরভিসন্ধি ও চক্রান্ত এবং লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেভাবে হিন্দু মহিলারা মিথ্যা প্রলোভনে লাভজেহাদের ফাঁদে পড়ছে, তাতে একদিকে জনভারসাম্য বিগড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের কথায় একজন করে শত্রু তৈরি হচ্ছে। ■

SURYA

Energising Lifestyles

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

lighting

fans

appliances

pipes

SURYA ROSHNI LIMITED

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657

/suryalighting I /surya_roshni